দু'চার কথা

ভূমিকা লেখার দুঃসাহস আমার নেই। প্রতিষ্ঠা যাঁদের আছে, তাঁরাই অন্যকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

তথাপি দু'চার কথা বল্‌ছি এজন্যে যে শ্রীবাস্তবের এই লেখাটীর সঙ্গে নাড়ীর একটা যোগ রয়েছে আমার। প্রধানতঃ নিজেও একজন উদ্বাস্তু—আর ক্রমাগত শুধু তাদের দুঃখের দুর্দশার, অপমান লাঞ্ছনার কথাই শুন্‌ছি, সেই ছবিই দেখ্‌ছি। কিন্তু যখন চোখ মেলে পথ চলি, তখন দেখি, হাজারে হাজারে তারাই আবার বাস্তু গড়ে তুল্‌ছে। জীবনসংগ্রামে কি অদ্ভুত-ভাবে যে তারা জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে! তারা রুক্ষ অনাবাদী মাটীতে ফসল ফলাচ্ছে। তারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এনেছে একটা প্রাণবন্যা। তাই "মহাযুদ্ধের একাঙ্কে" আছে আমারও মনের কথা।

রাজনীতি অনেক সময় সত্যের ধার না ধারতে বাধ্য হয়। বাস্তবের দিকে সে পেছন ফিরে থাকে। দীর্ঘকালের রাজ-নৈতিক কর্মজীবনে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তবু প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে যা' ছিল—এখন যেন তার চেয়েও বেশী করে একটা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগ চলেছে। শুধু রাজনীতিতে নয়—তারই প্রভাবে পড়ে দলীয় পত্রপত্রিকাও সত্যের প্রতি, বিচারবুদ্ধির প্রতি মর্যাদাশূন্য হয়ে পড়েছে।

এই সময়ে শ্রীবাস্তবের এই লেখা যদি পাঠকদের মনে দাগ কাট্‌তে পারে, আমিও সুখী হব।

রস বিচার এবং নাটকের টেকনিকের বিচার করবেন নাট্য-রসিকেরা।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

নাটকের চরিত্র-লিপি

পুরুষ :

আগন্তুক	
নাট্যকার	
পরিচালক	
দর্শকগণ	
হরিহর ঘোষাল	উদ্বাস্তু, মাষ্টার মশায়।
হরিশ "	ঐ বড় ছেলে।
হারাণ "	ঐ দ্বিতীয় ছেলে।
মণ্টু "	ঐ তৃতীয় ছেলে।
নন্তু "	ঐ ছোট ছেলে।
নিরঞ্জন রায়	কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী।
অজিত রায়	ঐ ছেলে।
সত্যসুন্দর চক্রবর্তী	জেলফেরৎ। নিরঞ্জনের বন্ধু।
সুধীররঞ্জন	ঐ পুত্র।
জীবন নায়েক	হরিহরের প্রতিবেশী।
সত্যানন্দ	'মর্মবাণী'র সম্পাদক।
বলরাম	রিপোর্টার।
সর্বেশ্বর	রাজনৈতিক কর্মী।
অনল	ঐ
রামরূপ	নিরঞ্জন রায়ের চাকর।
	—এবং অন্যান্য।

স্ত্রীলোক :

সিদ্ধেশ্বরী	হরিহরের স্ত্রী।
চঞ্চলা	নিরঞ্জনের স্ত্রী।
মানদা	সত্যসুন্দরের স্ত্রী।
অমলা	হরিহরের কন্যা।
অরূপা	রাজনৈতিক নারী কর্মী।
ঝি	চঞ্চলার ঝি।

মহাযুদ্ধের একাঙ্ক

প্রস্তাবনা দৃশ্য

[যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল, আঁধার মঞ্চ। সেই আঁধারে দমকা হাওয়ার মতো একজন লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। কঙ্কালসার দেহ, পোষাক-পরিচ্ছদ জীর্ণ—মুখে তাহার যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি। সে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে একবার কি খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর তাহার মুখে কথা ফুটিল।]

আগন্তুক। নাট্যকার! ওহে নাট্যকার! আরে, সব আঁধার কেন? আমিই বোধ করি ভুল করেছি, আলো তো তোমরা সইতে পার না, আঁধারে থেকে কল্পনার চোখে তোমরা দেখ জগৎকে, আর তাই নিয়ে লেখ নাটক। মঞ্চে যেমন রঙচঙ মেখে নট-নটীরা নেচে-গেয়ে হেসে-কেঁদে দর্শক ভোলায়, তেমনি তোমরা কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তোল সবকিছুকে, কৃত্রিমকে কর সত্য—নাট্যকার! নাট্যকার! আত্মপ্রকাশ কর। সত্যিকার মানুষকে, বাস্তব জীবনের একবার চোখ মেলে দেখ।

[নাট্যকার প্রবেশ করিলেন।]

নাট্যকার। কে, কে, কে, ডাকছে?

আগন্তুক। আমি। চিনতে পারছ না?

নাট্যকার। তুমি—তুমি কে?

আগন্তুক। তোমার নূতন নাটকের নায়ক।

নাট্যকার। নাটকের নায়ক?

আগন্তুক। বিশ্বাস হ'ল না? না হবারই কথা। তোমার নায়ক হবে একজন চমকলাগা রূপবান তরুণ—সে শুধু ভালবাসে আর প্রেম করে। বিরহ-বেদনার একটা অতি-নাটকীয় অবাস্তব ঘটনার পর তরুণ-তরুণীতে হয় মিলন অথবা বুকভাঙা বিচ্ছেদের হাহাকার, চোখের জল-টেনে-আনা ট্র্যাজেডী। এই তো কল্পনায় দেখেছ? দেশবিদেশের শোনা আর পড়া কথাই তোমাদের মূলধন। আজকাল নাকি বস্তিতেও ছুটোছুটি সুরু করেছ

তোমরা নায়ক-নায়িকার জন্যে। সে ছুটোছুটিও যদি সত্যি হ'ত! সেখানেও কল্পনা।

নাট্যকার। জানি না, কে তুমি। কিন্তু বাস্তব অনেক সময় কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এ কি—

আগন্তুক। সত্য, মিথ্যা নয়। আমি জানি। কিন্তু নাট্যকার! দুঃখ এই, তোমরা তা চোখ মেলে দেখ না, কান পেতে শোন না। শুধু জাবর কাট অন্যের দেখা আর শোনার। তাই বিদেশী চারা গাছে এদেশের মাটিতে ফসল ফলাতে চাও। জান না কাবুলের মাটিতে যে আঙুর ফলে বাংলার মাটিতে তা ফলে না।

নাট্যকার। কি বলতে চাও তুমি?

আগন্তুক। বলতে চাই, নূতন নাটক লিখবে তুমি, আমি হব তার নায়ক। বাস্তবকে উপেক্ষা করবে না, সত্যকে স্বীকার করবে সেই নাটকে। দেশের মর্ম উদ্ঘাটিত হবে আমার মধ্য দিয়ে—আমার মুখে ভাষা দেবে তুমি।

নাট্যকার। তুমি ফরমাস করবে আর তোমার কাহিনী লিখব আমি?

আগন্তুক। না, আমাকে জানবে, তারপর রূপ দেবে। নাট্যকার! বড় ব্যথা নিয়ে, জ্বালা নিয়ে এসেছি এখানে। আমাদের কাহিনীর নামে ছিনিমিনি খেলা চলছে চারদিকে। আমাদের, হতভাগ্য বাস্তুহারাদের কথা বলছি। নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতায় খুঁজি, আমি খুঁজি—দেখি তাতে আমি নেই, আমরা কেউ নেই।

নাট্যকার। তবে আছে কি?

আগন্তুক। আছে সত্যকে উপহাস আর বাস্তবকে ব্যঙ্গ। আছে শুধু তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা আর কল্পনার ব্যাভিচার। তোমরা শুধু দেখ আমরা পথে-ঘাটে পড়ে মরি, অনাহারে কাতরাই, আশ্রয়হীন হয়ে আর্তনাদ করি। আমরা নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পথভ্রষ্ট হই। আমরাও যে মানুষ, উপনিবেশের পর উপনিবেশ গড়ে তুলছি তা চোখ চেয়ে দেখ না। দেখে মনে হয়,—কিন্তু আমার সেই আসল চাবুকটি আর হাতে নেই। ফেলে এসেছি ছেড়ে-আসা গাঁয়ে আমার বিশ বছরের চেনা টেবিলের ওপর। সেই গাঁয়ে ছিল আমার সব—ছিলেন আমার গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর, আমার ধর্ম, আমার জীবনের মর্ম।

নাট্যকার। তুমি কি—

আগন্তুক। শোন, শোন নাট্যকার, তোমরা সবাই আমাদের নিয়ে সুরু করেছ ব্যবসা। সবাই—সবাই ব্যবসায় মেতেছে। আমাদের জন্যে দু' চোখে অশ্রুর বন্যা ব'য়ে যায়—ওজন করা সে বন্যার জল। যতটুকু লাভ আদায় হয়, ততটুকুই জল ঝরে। সংবাদপত্রে অত সংবাদ, অত হাহাকার, আস্ফালন কেন জান? ব্যবসার খাতিরে।

নাট্যকার। মনে হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণা অত্যন্ত বিকৃত—

আগন্তুক। সত্যি, বন্ধু, সত্যি। অনেক বেদনা স'য়ে তবে এ সত্যের সন্ধান পেয়েছি। তোমরা কতটুকু দেখলে আমাদের, কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে? তোমরা দেখলে ওইখানে অত্যাচার আর নারী-মাংসলোলুপতা—জানলে এখানেও আনাচে-কানাচে এমনি রক্তপিপাসুরা ওৎ পেতে রয়েছে। মানুষ এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বহুদেশে বহুবার, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা একটা জাতির জীবনের গোড়ায় পড়ল প্রচণ্ড আঘাত, উপড়ে ফেলে দিতে চাইল তারা আমাদের সব কিছু ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি। নাট্যকার, আমার শ্যামসুন্দর! আমার শ্যামসুন্দর!

নাট্যকার। শান্ত হও, শান্ত হও আগন্তুক। ধীরভাবে বল—

আগন্তুক। আমি অশান্ত নই, অধীর নই নাট্যকার। আজও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। এই শীর্ণ বুকে এখনো আমার অসীম বল, এখনো এই দু'টি কঙ্কালে সংগ্রামের শক্তি অবশিষ্ট আছে—আমি, আমার সন্তানেরা সবাই মিলে আবার প্রতিষ্ঠা করব আমার শ্যামসুন্দরকে, আমার ধর্মকে, আমার জীবনকে। তুমি সহায় হও, আমাকে পরিচিত ক'রে তোল বিভ্রান্ত জগতে—এসো, এসো নাট্যকার, তোমার নূতন নাটকের নায়ককে অনুসরণ কর।

[আগন্তুক মিলাইয়া গেল আঁধারের মাঝে। নাট্যকার তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন।]

নাট্যকার। তোমাকে নিয়েই লিখব আমি নূতন নাটক। কিন্তু কোথায় তুমি?

[নাট্যকার আগাইয়া গেলেন।]

[আঁধারে দৃশ্য মিলাইয়া গেল। কাহাকেও আর মঞ্চে দেখা গেল না। ঘণ্টা বাজিল—সংগে সংগে রেলওয়ে ষ্টেশনের গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা তুমুল রবে বাজিয়া উঠিল। ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ শব্দও ভাসিয়া আসিল। যাত্রী-জনতার কোলাহলও। এরই মধ্যে রংগমঞ্চে দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল, নাটক আরম্ভ হইল।]

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরে। লোকজন যাওয়া-আসা করিতেছে। সেখানে একজন লোক হাতে একগাছি বেত লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে একটা কোট, পায়ে ক্যানভাসের জুতা, চোখে চশমা। কোমরে চাদর-বাঁধা। যাহারা যাইতেছে তাহাদের কাহারো কাহারো দিকে তিনি আগাইয়া যান আবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাথা নাড়িয়া ফিরিয়া আসেন। উনি মাস্টার —নাম হরিহর ঘোষাল। বাস্তুত্যাগী মাস্টার মশায়। তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য করিতেছে। একটি মুটে মন্তব্য করিল যাইতে যাইতে, "এ বাবু পাগলা হ্যায়"। আর একজন, বলিল, "তাই বল।" মাস্টার মশায় বেত আস্ফালন করিয়া আগাইয়া গেলেন, তারপর কি ভাবিয়া যেন আবার পিছাইয়া আসিলেন। দূরে দাঁড়াইয়া একটি যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। যুবকের নাম অজিতকুমার। অজিত এইবার নিকটবর্তী হইল।]

অজিত। মাস্টার মশায়!

হরিহর। কে?

অজিত। আমাকে চিনতে পারছেন না?

[অজিত মাস্টার মশায়ের পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। তিনি কয়েক হাত পিছাইয়া গেলেন।]

হরিহর। না, না,—কে তুমি? আর কিছু নেই আমার। ছদ্মবেশ ধ'রে ভুলিয়ে আর কি নেবে?

অজিত। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না?

হরিহর। খুব চিনতে পারছি। বড় শহরের বড়লোক তুমি, সাজ-পোষাকে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। এ ছদ্মবেশ তোমার। অমনি ছিল ওই লোকটিও।

অজিত। আমি অজিত।

হরিহর। অজিত সুজিত বিজিত যাই হও, কি চাও?

অজিত। দেশ থেকে আপনি কবে—

হরিহর। আমার কথার উত্তর দাও। তোমাদের এই ভদ্র সাজ-পোষাককে আজকাল বড় ভয় করি।

[অজিত হতভম্বের মতো নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।]

হরিহর। কথা বল। জানো না এখনো এ কবজিতে জোর আছে. বেত মেরে মেরে তোমাদের পিঠে দাগ কেটে দিতে পারি! ভদ্রলোক সেজে রয়েছ বুঝি জাল-জোচ্চুরি করবার জন্যে? শাসন করবার কেউ নেই ভেবেছ?

[দূর হইতে হরিহরের দ্বিতীয় ছেলে মণ্টু অজিতকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।]

হরিহর। তুমি আবার এদিকে কেন? বলেছি না ওদিকে খুঁজে দেখতে? এখানে আমিই সহস্রলোচন হয়ে আছি। যদি থাকে কোথাও, আমার চোখ এড়াতে পারবে না।

[মণ্টু অজিতের কাছে আসিয়া তাহাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গেল।]

মণ্টু। বাবা কি রকম হয়ে গেছেন অজিতদা। একটি দুর্ঘটনায় এ রকম হয়েছে—বাড়িতে গেলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

অজিত। এতটা যে আশা করতে পারি নি মণ্টু। আমাদের সেই মাস্টার মশায়—

হরিহর। আরে, কেঁদে ফেলবে নাকি? এখনো তো বেত মারি নি। ওঃ, এও বুঝি একটা ফিকির? কত ভেল্কিই তোমরা জান! না, না, চোখের জল ফেলো না।

অজিত। আমাকে অবিশ্বাস করছেন মাস্টার মশায়? আমি যে আপনার—

হরিহর। ছাত্র ছিলে? মইজুদ্দিনও আমার ছাত্র ছিল না? কত শাসন তাকে করেছি। শ্রদ্ধাও করত। শেষ দিনটিতেও বেতটি তারই পিঠে

ভাঙতাম, যদি না মাথায় লাঠি মেরে এক ব্যাটা গুণ্ডা আমায় অজ্ঞান ক'রে দিত। সেই মইজুদ্দিন আমাকে স্কুল ব'য়ে মাস্টারী শেখাতে এসেছিল। কি দুঃসাহস! তাতেও আমি বাস্তুত্যাগ করব ব'লে ভাবিনি। কিন্তু একদিন আমার শ্যামসুন্দরকে কারা চুরি ক'রে নিয়ে গেল!

অজিত। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর?

হরিহর। ঘোষাল বংশের জীবন-দেবতা শ্যামসুন্দর। জানি তো, তাঁকে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ আসলে তিনি তো বাস করছেন আমাদের বুকে। কিন্তু ওই যে ওদের হাত বাড়ানো, সে তো আমাদের বুক থেকেও তাঁকে উপড়ে ফেলবার প্রথম ধাপ। তারা একটা জাতির হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে চায়। মোগল তা' পারেনি, পাঠান তা' পারেনি, ইংরেজ পারেনি। তাই চ'লে এলাম, পালিয়ে এলাম। কিন্তু এখানে? তোমার মতো সাজপোষাক-পরা একজন এসে জোচ্চুরি করে আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল। ওরা যে লুটপাট করে দিন দুপুরে ডাকাতি করে নেয় সেও ভাল। গুণ্ডামী বোঝা যায়, কিন্তু গুণ্ডা জোচ্চোর নয়।

অজিত। ওখানেও সবাই ডাকাত-লুটেরা নয়, এখানেও সবাই জোচ্চোর নয়। আপনার মতো জ্ঞানী লোক—

হরিহর। তাই তো আমি বলতে চেয়েছিলাম, আজো চাই। বড় দুঃখে, কি যে বেদনায় এসব বলি তুমি বুঝবে না। আজকাল ভাবি কি জানো, সব দোষ মাস্টারদের, তারা শিক্ষা দেয় নি, শুধু দায় সেরেছে, নইলে—

মণ্টু। বাবা! এবার বাড়ি চল।

অজিত। বাড়ি চলুন মাস্টার মশায়।

হরিহর। ওকে খুঁজে দেখব না, এখনই চ'লে যাব? সে হয় না। আমি তাকে একবার কাছে পেতে চাই। জিজ্ঞাসা করতে চাই—কোন্ মাস্টারের কাছে কোথায় সে শিক্ষালাভ করেছে? জান,—আমি যদি তার মাস্টার হতাম, তা হ'লে প্রায়শ্চিত্ত করতাম, মরণপণ অনশন করতাম।

অজিত। আমরা তাকে খুঁজে বার করবার ভার নিলাম। মণ্টু তাকে দেখেছে, সে আমার সঙ্গে থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলুন।

হরিহর। না না, তোমরা পারবে না।

অজিত। পারব, আমি যে আপনারই ছাত্র।

হরিহর। সত্যি বলছ? আমার ছাত্র, তুমি নিরঞ্জন রায়ের ছেলে অজিত?

অজিত। হ্যাঁ, আমি সেই অজিত রায়। একদিন আপনার বেত কেটে বসেছিল আমার পিঠে. গুরুতর ছিল আমার অপরাধ। আমি অধঃপাতের পথে চলেছিলাম। সে আঘাত আমাকে আরো উন্মাদ করে তুলেছিল। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে যখন আপনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন, সেইক্ষণ থেকে—জানি না মানুষ হয়েছি কি না, কিন্তু যখনই সেদিনের কথা মনে আসে তখনই মনে হয় যদি আপনাকে কাছে পেতাম, তা হ'লে একবার আপনার পায়ের ওপর মাথা রেখে—

হরিহর। ওরে থাম্, থাম্, আমার চোখেও জল টেনে আনিস নে। মানুষ আজো তা হ'লে আছে—আছে—

[সত্যসুন্দর নামক একটি লোকের প্রবেশ। মলিন পোষাক-পরিচ্ছদ, ছেঁড়া জুতা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঞ্জাল।]

সত্যসুন্দর। নিশ্চয় আছে. এই তো আমি একজন জলজ্যান্ত মানুষ। ওহে অজিতবাবু! পকেটে যেন একটা ছোট্ট মনিব্যাগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খোল তো, খুলে কিছু আমাকে দাও। বেশি নয়. এই পেট পুরে খাওয়ার মত কিছু।

হরিহর। কে তুমি?

সত্যসুন্দর। এই যে বললাম, মানুষ। পেটে ক্ষিধের জ্বালা। তা মেটাবার জন্যে হাত না পাতলেও চলত, অনায়াসে চিরন্তন বৈজ্ঞানিক কৌশলে আমিও স্টেশনের ভিড়ের মাঝখান থেকে ক্ষিধে মেটাবার উপাদান জুটিয়ে নিতে পারতাম। দশ বছরের ট্রেনিং পাওয়া ছাত্র। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার বক্তৃতা শুনে শুনে ভাবলাম, মাস্টার মশায়কে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? (হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

হরিহর। হাসছ যে? তুমিও একটা জোচ্চোর।

সত্যসুন্দর। ঠিক বুঝতে পারছি না, জোচ্চোর কিনা! তবে হ্যাঁ, দশ বছর আগে একদিন—সে কথা পরে হবে মাস্টার মশায়। আপাতত আমি দাবী জানাচ্ছি, এই অজিতবাবুর কাছে, পেটের ক্ষিধেটা মেটাবার দাবী—যার পকেট খাঁ-খাঁ করছে তার দাবী যার পকেটে পয়সা ঠাসাঠাসি হয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে মরছে তার কাছে। দাও বাছা, খেয়ে-দেয়ে খুঁজে বের করব প্রথম আমার এক বন্ধুকে, তারপর আপনার পদতলে ব'সে শিক্ষা নেব, কি বলেন? খুঁজে আপনাকে নিতে পারব।

হরিহর। অদ্ভুত! দিয়ে দাও অজিত, যখন খাবার চাইছে, খেতে চাইলে কাউকেই আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমার পকেটে তো দেবার মতো কিছু নেই, তুমিই, দিয়ে বিদেয় কর।

সত্যসুন্দর। বিদেয় আমি সহজে হব না, এই তো মাত্র নূতন নাটকের শুরু, এখনই যদি বিদেয় হয়ে যাই তা হ'লে নাটক জমবে কেন? দশ বছর আগে আমার নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়েছিল, তারপরই ঢাকা পড়েছিলাম যবনিকার অন্তরালে, এই শুরু হ'ল দ্বিতীয় অঙ্ক। দাও, দাও—(অজিত একটা টাকা দিল) একেবারে একটা টাকা? দরাজ হাত—ফুটো পয়সা হাতে ওঠে নি! বড় বাপের ছেলে, কি নাম বলছিলেন উনি—নিরঞ্জন রায়! নিরঞ্জন রায়!

হরিহর। এবার বিদেয় হও।

অজিত। আপনি চলুন মাস্টার মশায়।

[হরিহর, অজিত ও মণ্টু চলিলেন। সত্যসুন্দর হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।]

সত্যসুন্দর। অদ্ভুত, না? নিশ্চয়ই অদ্ভুত! সত্যসুন্দর! এককালে সত্য ও সুন্দরের কল্পনা ক'রে বাবা নামটি রেখেছিলেন। শিক্ষায়, সভ্যতায় ঐতিহ্যে,—অদ্ভুত! থাম, থাম বন্ধু, (পেটে হাত বুলাইল) অধীর হয়ো না, দেখছ না একটা টাকা হাতে। জাল নয় তো? না। টাট্‌কা নোট।

[এক টাকার নোটখানা তুলিয়া ধরিয়া ফুঁ দিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হরিহরদের বাড়ী, বস্তির ঘর। সেই ঘরে তখন হরিহরের স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী ও তাঁর বড় ছেলে হরিশ উপস্থিত।]

হরিশ। জানি মা, বাবা মনে বড় বেশী আঘাত পেয়েছেন তাই আগের সব ধীরতা তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু সে জন্যে চিন্তা ক'রো না, আবার তিনি ঠিক আগের মতো হয়ে উঠ্‌বেন।

সিদ্ধেশ্বরী। আমিও জানি হরিশ, কিন্তু ক'দিন ধ'রে ভোর হতে-না-হতেই স্টেশনে ছুটে যাচ্ছেন—মণ্টুকে বাধ্য হয়ে পেছনে যেতে হচ্ছে, সারাদিন সেখানে দু'টি প্রাণীর উপোসে অস্বস্তিতে কাটছে। এ করে ক'দিন দেহটা খাড়া রাখতে পারবেন রে?

হরিশ। পারবেন মা, পারবেন। তাঁর মতো মনের বল আর ক'জন লোকের আছে?

সিদ্ধেশ্বরী। আর তা' নেই।

হরিশ। আছে মা, আছে।

সিদ্ধেশ্বরী। তোদেরও তো কিছু হচ্ছে না! যদি হ'ত, তা হ'লে হয় তো সব ছেড়ে আসার দুঃখ তিনি ভুলতে পারতেন।

হরিশ। মা বুঝি ভেবেছিলে, এখানে সবাই আমাদের জন্যে কাজ নিয়ে বসে আছে, টাকা-পয়সা-ধন-রত্ন এখানে পথেঘাটে গড়াচ্ছে?

সিদ্ধেশ্বরী। তা ঠিক নয়, তবে দেশ স্বাধীন হয়েছে—

হরিশ। তাইতে তো জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা আরো বেড়েছে। বিদেশীর রাজত্বে দায়িত্ব ছিল তাদের, আজ যে নিজেদের দেশে নিজেদের দায়িত্ব।

সিদ্ধেশ্বরী। কি জানি বাপু, এত বড়ো বড়ো কথা বুঝি না। শুধু বুঝেছিলাম, সুখের আর শান্তির জন্যেই স্বাধীনতা।

হরিশ। সত্যি কথা মা, কিন্তু পরাধীনতার পর যে স্বাধীনতা আসে তাতে সুখ-শান্তি অমনি থাকে না, তা গ'ড়ে তুলতে হয়, সে গ'ড়ে তোলায় প্রত্যেকটি মানুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রয়োজন।

সিদ্ধেশ্বরী। রাখ্ দেখি, এসব তত্ত্বকথা। আসল কথা হচ্ছে ওঁকে

যদি বাঁচাতে হয় তা হ'লে তাড়াতাড়ি তোদের একটা কিছু করা দরকার। তিন ভাই মিলে পারবি না কেন?

[অমলা প্রবেশ করিল।]

অমলা। আর আমি? মেয়ে ব'লে বুঝি আমি কিছুই করতে পারি না?

["দাদা! দাদা!" বলিয়া নন্তু প্রবেশ করিল।]

হরিশ। আর আমাদের নন্তু ভাই? সে—সে দেখবে মা কি করে! অমলা সত্যিই বলেছে, আমরা পাঁচ-পাঁচটি সন্তান, তোমাদের চিন্তা কি! আবার দেখবে সংসার গ'ড়ে তুলেছি. আবার মন্দিরে শ্যামসুন্দরের পূজা হবে, সেই উৎসব আনন্দ—

সিদ্ধেশ্বরী। ভগবান তাই করুন, তাই করুন হরিশ।

নন্তু। আচ্ছা দাদা, রাম বড়, না, রাবণ বড়?

হরিশ। নিশ্চয়ই রাবণ। দশটা মাথা. বিশখানা হাত, ইয়া গোঁফ, গালপাট্টা, আর এত্তো বড়ো বড়ো এক কুড়ি চোখ, একবার এদিকে ফিরছে. একবার ওদিকে।

নন্তু। কখনো না, রাম বড়ো। রামের বাণে সে একেবারে অক্কা পেল। রাক্ষস আবার বড় হয়? রাম. রাম বড়। তুমি আমাকে বলবে দিদি রামের গল্প, সেজদা সবটা বলতে পারলে না।

অমলা। নিশ্চয়, নিশ্চয় বলব। কিন্তু তার আগে তুমি নামতাটি মুখস্থ করবে. কালকের পড়াটা শিখবে। তারপর আমি গোটা রামায়ণ বলতে শুরু করব।

[বাইরে জীবনবাবুর গলা শোনা গেল. "হরিশ বাড়ী আছ নাকি. হরিশবাবু"—]

হরিশ। আসুন, আসুন জীবনকাকা, ভেতরে আসুন। তোমরা এবার যাও মা—

সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু তোকে যে আবার বেরুতে হবে রে, মনে রাখিস্।

হরিশ। নিশ্চয়ই থাকবে মা। পেটই মনে করিয়ে দেবে।

[সিদ্ধেশ্বরী, অমলা ও নন্তু প্রস্থান করিলেন ভিতরে। বাহির হইতে আসিয়া রোয়াকে উঠিলেন জীবন।]

হরিশ। আসুন।

জীবন। এ কি শুনছি হরিশ, তুমি চাকরিতে ইস্তফা দিলে?

হরিশ। সত্যি শুনেছেন।

জীবন। বিশ্বাস করতে এখনো যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকছে। বেকারেরা হাজারে হাজারে মিছিল ক'রে আর্তনাদ করছে। কা কস্য পরি-বেদনা—কেউ শুনছে না, কারো কিছু হচ্ছে না। তুমি চট্ ক'রে একটা চাকরি পেয়ে গেলে আর পট্ ক'রে কথা নেই বার্তা নেই ছেড়ে দিলে? ভাবতেই কেমন যেন মাথায় গোল বেধে যায়।

হরিশ। বাধবারই কথা। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, নয় জীবনকাকা?

জীবন। অস্বাভাবিক? অসম্ভব, অদ্ভুত কাণ্ড। নিজের কপাল খেলে, আমাকেও বাচাল বানালে।

হরিশ। জানি না, ঠিক আপনারই সুপারিশে মুখার্জী সাহেব চাকরী দিয়েছিলেন কিনা—

জীবন। অকৃতজ্ঞ একেই বলে।

হরিশ। ওঁরা ঠিক সাধারণ লোক তো নন। তথাপি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি চিরকাল।

জীবন। থেকে আমাকে কৃতার্থ করবে। মুখার্জি সাহেব আমার কথা রাখবে না? জান না হরিশ, জীবন নায়েকের সঙ্গে তোমাদের ক'দিনেরই বা জানাশোনা। কিন্তু মুখার্জি সাহেব, সাহেব হ'ল কবে জান? থাক্ সে কথা। কথা হচ্ছে চাকরীটা ছাড়লে কেন?

হরিশ। ছাড়লাম অকৃতজ্ঞ হব না ব'লে, নিজেকে এবং মালিককে ফাঁকি দেব না ব'লে।

জীবন। এ যে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা আরম্ভ করলে হে!

হরিশ। বক্তৃতা নয় জীবনকাকা। খোলা গলায় সত্য কথা বলছি। কাজে গিয়েই দেখলাম, একটা অদ্ভুত অবস্থা। ফ্যাক্টরীর লোকেরা দু'-দল বেঁধে জটলা করছে —কর্তাদের দলাদলির কল্যাণে। একই দলের ইউনিয়ন ভেঙে দু'খানা হয়ে গেছে। ফ্যাক্টরীর লোক কাজকর্ম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে আছে স্ট্রাইকের জন্যে।

জীবন। তাতে তোমার কি হ'ল শুনি?

হরিশ। অনেক কিছু হ'ল। প্রথমত আজ আর ওসব সংগ্রামে মাতবার মত অবসর নেই—

জীবন। এটাও তোমরা—ওই কি বল, জীবন-সংগ্রাম।

হরিশ। না, এটা অন্যদের ক্ষমতার লড়াইএ সৈনিক হওয়া।

জীবন। কি যে তোমরা বল।

হরিশ। আমার নীতিবোধ কি বলে জান জীবনকাকা? চাকুরি স্বীকার ক'রে, নেহাৎ আত্মমর্যাদায় আঘাত না লাগলে, সুযোগ বুঝে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করা অন্যায়।

জীবন। খুব নীতিবোধ! আশ্চর্য! এ নিছক বোকামি। জান, ইউনিয়ন নিয়ে যারা দু'ভাগ হয়ে লড়াই করছে, ওই মুখাজী সাহেবও সেই দলেরই লোক। মাসে মাসে মোটা চাঁদা দিচ্ছেন, দহরম-মহরম চলছে নেতাদের সঙ্গে। যাক, যার কপালে নেই—তার আর কি করে হবে? তা বাবাজীবন, ভেরেণ্ডা ভাজ এখন। এক কাপ চায়ের ফরমাস দিতে পার?

হরিশ। অত্যন্ত দুঃখিত, জীবনকাকা।

জীবন। চমৎকার! বি. এ. পাস করেছিলে না?

হরিশ। ফেল করেছিলাম। কারণ পাস করার চেয়ে দেশের স্বাধীনতা তখন—

জীবন। ফেল-করা ছাত্র না হ'লে এমন হয়? দেশ! ভিটে নেই, মাটি নেই তার আবার দেশ! এক কাপ চা পর্যন্ত—

[অমলা প্রবেশ করিল।]

অমলা। আপনি অপেক্ষা করুন, চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি।

হরিশ। যদি এক কাপের মতো চা চিনি থাকে তবে বাবার জন্যে রেখে দে অমু। জীবনকাকা তাঁর বাড়িতে গিয়েই খাবেন, আমিও এক কাপ সেখানেই খেয়ে যাব। চলুন। আমাকে এখন খাবার জুটাতে বেরুতে হবে।

জীবন। আবার হাসছ? হাসিও আসে!

হরিশ। আজ পর্যন্ত কখনো কাঁদিনি জীবনকাকা, তাই বোধ করি বেঁচে আছি।

[জীবন ও হরিশ চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

সিদ্ধেশ্বরী। হরিশটা কি বল দেখি অমু, ভদ্রলোক চা চাইলেন, আর সে কিনা—

[বাইরে হরিহরের গলা শোনা গেল। হরিহর বলিতেছিলেন, "তুমি বিস্মিত হ'য়ো না অজিত। এসব জায়গায়ও মানুষই বাস করে। আগে ভাবতাম কত কি! এখন মিশে দেখছি চমৎকার মানুষ এরাও—দরদে ভরা মানুষ, তোমাদের ওই ভদ্রলোকদের চেয়ে অনেক ভাল, সরল, অকপট মানুষ। ওরা অপরাধ করলেও করে সারল্যের সঙ্গে।"]

অমলা। বাবা আসছেন মা। এত তাড়াতাড়ি এলেন? আমরা খেয়ে ব'সে আছি, বাবার কি হবে?

সিদ্ধেশ্বরী। পাগলী, মুখ কালো করিস নে। কি হবে সে আমি দেখব।

অমলা। তুমি খাও নি বুঝি? আগেই জানতে বাবা তাড়াতাড়ি আসবেন?

সিদ্ধেশ্বরী। মন আমার গুণতে জানে রে।

[হরিহর সঙ্গে অজিত ও মণ্টুকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। একটা মাদুর বিছিয়ে দে অমু, আমাদের অজিত। নন্তু কোথায় রে, নন্তু—আমার রঘুপতি রাঘব রাজা রাম?

[নন্তু প্রবেশ করিল। অমলা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিয়াছে। অজিত সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। নন্তু বাবাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। মণ্টু ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।]

নন্তু। কিছু এনেছ বাবা?

হরিহর। নিশ্চয়—এই নাও। কি বল দেখি?

নন্তু। বাতাসা।

হরিহর। আচ্ছা, বাতাসা ভাল, না টফি লজেন্স ভাল?

নন্তু। বাতাসা ভাল। রাম বাতাসা খেতেন, নয় বাবা?

হরিহর। রামায়ণে যদিও লেখে না, তবু সেকালে টফি লজেন্স যে ছিল না—এ জানা কথা।

নন্তু। তা হ'লে নিশ্চয় বাতাসা খেতেন।

হরিহর। তাই সম্ভব—নইলে তুমি খাবে কেন?

[সবাই হাসিল। অজিত বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিল, বাড়ীতে পা দিয়াই হরিহর কেমন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গিয়াছেন। নন্তু বাতাসা লইয়া চলিয়া গেল।]

হরিহর। ব'স, ব'স অজিত। জান তো পকেটে ক'টি পয়সা মাত্র ছিল। নন্তুর মন জোগাতে হ'লে এ ক'জনের ট্রামে-বাসে চেপে আসা চলে না। তাই পায়ে হেঁটেই আসতে হ'ল। আমার সঙ্গে পড়ে অজিতের খুব কষ্ট হয়েছে। উপায় ছিল না। ওর সঙ্গে কথা বল্ অমু, আমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুইগে।

[হরিহর বাড়ীর ভিতরে গেলেন।]

অমলা। তুমি আশ্চর্য মা। যদি জানতে বাবা তাড়াতাড়ি আসবেন—

সিদ্ধেশ্বরী। কি যে বলিস অমু! যা' আছে তা'তে আমাদের দু-জনার—

অমলা। রক্ষা কর, আর না, বাবাকে দেখগে এবার।

সিদ্ধেশ্বরী। তুমি ব'স অজিত, কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম, কিন্তু বড় দুর্দিনে এ দেখা বাবা। তোমাকে পর ভাবি না কখনো। আমি আসছি।

[সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া গেলেন।]

অমলা। ব'স না অজিতদা। চেয়ার এখানে নেই, দাঁড়িয়ে থাকলেও—

[একখানা তিন-পা'ওয়ালা হাতল-শূন্য চেয়ার লইয়া মণ্টু প্রবেশ করিল।]

মণ্টু। বললেই হ'ল নেই? ঘোষাল-পরিবারের মান-সম্ভ্রম কিছুই তুমি থাকতে দেবে না দিদি। নেই কেন? এই তো, দেখ। এ একেবারে হোমমেড অজিতদা—স্বয়ং মণ্টু ঘোষালের তৈরী। এখনও একখানি পা' জোটাতে পারি নি, তাই তিন পা' দিয়েই চালিয়ে নিচ্ছি। একটুখানি কৌশল ক'রে বসতে হয়, সেও দু'চার দিনের জন্যে। তারপর—নেই?

অমলা। এবার রক্ষে কর মণ্টু—

[অজিত ততক্ষণে হাসিমুখে মাদুরে বসিয়া পড়িয়াছে।]

মণ্টু। নেই বলছ কেন তুমি? আচ্ছা অজিতদা, দাঁড়াও—

[মণ্টু দ্রুতপদে ভিতরে গেল। তারপর একটা টিনের বাক্স হাতে লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার ডালা খুলিয়া ধরিল অজিতের সম্মুখে।]

অমলা। মণ্টু!

মণ্টু। দেখ অজিতদা! আমাদের নেই কি? এই দেখ, সেটি, সোফা, চেয়ার, টেবিল, পালঙ্ক, গদি আঁটা বিছানা, মশারি, বালিশ সব আছে—একেবারে ডবল বেড খাট। সবই আছে, নেই শুধু—

অমলা। মণ্টু! তুই যা—লজ্জা করে না!

মণ্টু। দিদির নিজের হাতের তৈরী অজিতদা!

[পলাইয়া গেল মণ্টু।]

অজিত। কল্পনার ভবিষ্যৎ তোমার অমলা?

অমলা। খেলাঘর—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

অজিত। আমি বোধ করি তোমাকে আঘাতই করলাম।

অমলা। আঘাত আমার লাগে না, কেউ করতে পারেও না। কিন্তু এসব কথা থাক্। তুমি আজকাল কোথায় আছ, কি করছ?

অজিত। আপাতত এখানেই আছি আর এই পরম লগ্নে তোমার সঙ্গেই কথাবার্তা বলছি।

অমলা। আগে আঘাত কর নি অজিতদা, কিন্তু এবার বিদ্রূপ করলে।

অজিত। বিদ্রূপ করলাম তোমাকে?

অমলা। শুনেছি তোমরা এখন কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর দলে, তাই সর্বহারা একজন গরীবের মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়টাকে পরম লগ্ন বলা কি বিদ্রূপ নয়?

অজিত। তুমিও আজকাল সর্বহারা-জোটে ভিড়ে পড়েছ অমলা—অধুনা তোমাদের মত ছেলেমেয়েরা নাকি সবাই ওইখানেই ভিড় জমাচ্ছে?

অমলা। ভুল করলে। কলকাতায় এসে শুনছি অভিজাতদের—

সম্পদশালীদের মধ্যেই সর্বহারা সাজবার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জায়গা পাব কেন?

[সিদ্ধেশ্বরী প্রবেশ করিলেন।]

সিদ্ধেশ্বরী। তোমাব মাস্টার মশায়কে তো দেখলে বাবা শিয়ালদায়' একটি দিনের ঘটনায় তিনি এমন হয়ে গেছেন, দুনিয়াশুদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর কাছে যেন চরিত্রহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বাড়িতে এলে কিছু সময়ের জন্যে একটুখানি শান্ত ও স্বাভাবিক থাকেন।

অজিত। এ সাময়িক মাসীমা। তাঁকে তো জানি, এ মানুষ বেশি-দিন আঘাতের বেদনা নিয়ে থাকতে পারেন না।

সিদ্ধেশ্বরী। তোমার কথাই সত্য হোক বাবা।

অমলা। অজিতদার জন্যে অন্তত এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে মা, আমাদের মণ্টু বাবু বলেছেন, নেই কি আমাদের?

সিদ্ধেশ্বরী। জল চড়িয়ে এসেছি, তুই ভেতরে যা।

[অমলা ভিতরে চলিয়া গেল। এক তাড়া ঠোঙা হাতে লইয়া মণ্টু প্রবেশ করিল।]

সিদ্ধেশ্বরী। পাগল ছেলে!

[মণ্টু চলিয়া গেল।]

অজিত। মণ্টু চিরকালের ভাল ছেলে।

[হরিশ ও হারাণ প্রবেশ করিল। হারাণের হাতে একটি ব্যাগে চালডাল ও কিছু শাকসব্জী।]

হারাণ। হুঁ, আর হারাণ? সে মন্দ ছেলে, কি বল অজিতচন্দ্র? কোত্থেকে এসে আজ হঠাৎ উদয় হলে? এই নাও মা, চাল, ডাল, কুমড়ো, কচু আর এই নাও নগদ একটি টাকা। হারাণ তোমার কম নয়। জান অজিত, ক'দিনে কলকাতার আনাচ-কানাচ গলিঘুঁজি কিছু আর অপরিচিত থাকে নি। পাঁচু খানসামার গলি থেকে আরম্ভ করে মহামতি গোখলে রোড, রাইটারস্ বিল্ডিং থেকে সুরু করে ঘুঘুডাঙা বেকারবান্ধব সমিতি, হাওড়া থেকে হাবড়া, সখের বাজার থেকে ঠকের হাট কিছুই বাকি রাখি নি—কাজ দাও, চাকরি দাও। উঁহু, সব জায়গায়ই এক কথা, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। কিন্তু ধৈর্য

হারালে চলবে কেন?

অজিত। এসব কথা পরে শুনব হারাণদা! হরিশদাও এসে ভালই হ'ল। তোমাদের দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে যেন আমাদের সেকাল ক্রমশ ফিরে পাচ্ছি, তাই—

হারাণ। থাম অজিত! এই তো শতকরা নিরানব্বইজন বাঙালীর মতো বক্তৃতা জুড়ে দিলে! বড় বেশি কথা বলে বাঙালীরা। অবাঙালীরা কিন্তু তা নয়। একটি 'হ্যাঁ জী' নয়তো 'না জী'। ব্যাস, হয়ে গেল। আমিও কাজের লোক, আমার জীবনের আদর্শ হ'ল, কথা নয় কাজ। সেই কাজের তাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তো বেড়াচ্ছিই—আজ ভোরবেলা ঘুরতে ঘুরতে জল-তেষ্টা পেয়ে গেল, এক বাড়িতে ঢুকে পড়ে চাইলাম, ঘটি করে হোক, গ্লাসে করে হোক অথবা মগে করেই হোক জল চাই। এক মহিলা গ্লাসে করে জল নিয়ে এলেন, সঙ্গে একটি আস্ত সন্দেশ। সন্দেহ হ'ল। হ্যাঁ, সন্দেহ বইকি! জল দিতে গিয়ে সন্দেশও দেয়? বলে বসলাম, তা হলে চাকরিও দিতে পারেন? লেগে গেল মা। তাঁর ভাইয়ের প্ল্যাস্টিকের কারখানা টালিগঞ্জে। ছুট টালিগঞ্জ—সেখানে ষাট টাকার চাকরি, পাঁচ টাকা অ্যাডভ্যান্স।

হরিশ। সত্যি অজিত, বাঙালীরা বড় বেশি কথা বলে।

হারাণ। তোমরা বল, আমি টু দি পয়েন্ট ছাড়া বলি না। মা, এগুলো নিয়ে যাও। টালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে আর একজনের রেশনকার্ড ধার করলাম, কালকে আমাদের কার্ড দেওয়ার সর্তে—

সিদ্ধেশ্বরী। এবার থাম বাবা—কাপড় জামা ছেড়ে তারপর এসে কথা-বার্তা বল। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

[হরিহর প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। দাঁড়াও। হারাণ, কোত্থেকে নিয়ে এসেছ এগুলো? জোচ্চুরি করে, না, কারো পকেট মেরে?

হারাণ। না, বাবা—তেমন কৃতিত্ব এখনও লাভ করতে পারি নি—এ ক'দিন—

হরিহর। কলকাতায় এসেছ, বিদ্যাটি লাভ করতে ক'দিন? আজ মনে হয় কি জান, ওই যে সার-বাঁধা দালান-কোঠা, ওর ভিত সততা, সাধুতা এবং

সত্যের ওপর গ'ড়ে ওঠে নি। বিশ্বাস আর কাউকে আমি করি না,—আমাদেরই গাঁয়ের চরণদা কলকাতায় এসে তিন জনের পরিবারের জন্যে ন'খানা রেশনকার্ড করেছেন, বাজারে চোরাবাজারের দরে চাল চিনি বিক্রী করছেন নিজের হাতে। আমার সামনে ধরা পড়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, উপায় নেই। তাই এই করছি হরিহর—

হারাণ। কি করে আমি এগুলি পেয়েছি সব বলছি বাবা। তোমার পা ছুঁয়ে—

হরিশ। ও যে এক প্লাষ্টিকের কারখানায় চাকরী পেয়েছে বাবা।

হরিহর। সত্যি? যদি সত্যি হয়, সুখী হব।

হারাণ। মিথ্যা আমি কখনো বলি না।

হরিহর। ভয় কেন জানিস? মিথ্যাই যে আজ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে রে, তাই একটি স্কুল মাষ্টার তার পিছিয়ে-পড়া ধারণা নিয়ে এই এগিয়ে-যাওয়া দেশে শিউরে উঠে।

হরিশ। আমারও আবার একটা চাকরী হয়েছে। এক ভদ্রলোকের প্রাইভেট সেক্রেটারী, তাঁর বক্তৃতা ইত্যাদি লিখে দিতে হবে।

হরিহর। ভাল। এটাও থাকবে না এ আমি জানি।

[হরিহর, হরিশ, হারাণ ও সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে গেলেন। এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল অমলা। মণ্টুও বাহির হইতে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে মাটির খুরীতে একটি রসগোল্লা।]

অমলা। চা নাও অজিতদা।

মণ্টু। আর এই রসগোল্লাটি। সাত আনা মাত্র পেয়েছি, দু' আনার বেশী তোমার জন্যে খরচ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। বাবার তামাক-টিকে আনতে হ'ল।

[মণ্টুও ভিতরে চলিয়া গেল।]

অমলা। চায়ের পেয়ালা হাতে নাও অজিতদা।

অজিত। নিচ্ছি। কিন্তু মণ্টুর দেওয়া রসগোল্লা আমার গলায় সরবে না।

অমলা। কেন, অতি সামান্য ব'লে?

অজিত। অসামান্য ব'লে। আমি এর উপযুক্ত নই।

অমলা। মুখের এমন ভাব করেছ, যেন কেঁদে ফেলবে। ছিঃ অজিতদা! এত দুর্বল তুমি তো ছিলে না?

অজিত। কিন্তু সব স'য়ে থাকাই সবলতা নয়। আঘাতে বেদনাবোধ করে যারা কাঁদতে পারে, তারাই ফিরে আঘাতও করতে পারে। দুর্বলই কাঁদতেও ভয় পায়, পালিয়ে যায়।

অমলা। তা হ'লেও সামান্য কারণে কাঁদলে লোকে হাসবে।

অজিত। জানি না লোকে কি করবে! কিন্তু তোমাদের এ অবস্থায় দেখব এটুকু যে আমি ভাবিনি।

অমলা। সব কিছুই কি ভাবা যায়! তা ছাড়া এর চেয়েও দুঃখ-দুর্দশায় আছে কত লোক। সবার জন্য কি তোমার চোখে জল আসবে?

অজিত। জানি না। ওদের দূরে থেকে দেখি, কাছে যাই না।

অমলা। এ কথাটা সত্য নয় অজিতদা।

অজিত। কি জানি, কিন্তু অমলা, এখানে এ সব দেখে, তোমার এই—

অমলা। তাই বল, অমলার জন্যে দুঃখ হচ্ছে, বিমলার জন্যে হত না।

অজিত। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা উচ্চ বলেই মনে হচ্ছে।

অমলা। তুমি ভুল করলে। তোমার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করেই আমরা আনন্দিত হই—বাবার হাতে-গড়া ছাত্র তুমি।

অজিত। সুখী হলাম। আমার একটা আবেদন রাখবে অমলা?

অমলা। আবেদন?

অজিত। তাই। মাস্টার মশায়কে আমার বড় ভয়। আমি নিজে আজকাল যথেষ্ট না হলেও মন্দ উপার্জন করি না, তাই মাস্টার মশায়কে এই দুঃখের সময়ে কিছু দক্ষিণা দিতে চাই। আমার হয়ে এ টাকাগুলি তুমি দেবে তাঁকে?

অমলা। না না, অজিতদা, না। দুঃখের সময়ে না, যদি কোনদিন সুখের সময় আসে—

অজিত। ফিরিয়ে দিয়ো না অমলা। আমারও প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, মনুষ্যত্ব আছে—

অমলা। ভুল করছ তুমি অজিতদা।

অজিত। ভুল যদি হয়, আমার জন্যে না হয় তুমিও একদিন ভুলই করলে। নাও, নাও—

[অজিত জোর করিয়া অমলার হাতে নোটগুলি গুজিয়া দিল। অমলা বিব্রত হইল। সহসা প্রবেশ করিলেন হরিহর।]

হরিহর। (চীৎকার করিয়া) আমার বেত, আমার বেত! অজিত, তুমি এমন হয়েছ? অমলা, ফেলে দে, ছুঁড়ে ফেলে দে এর মুখের ওপর।

অমলা। বাবা! আমি নিতে চাই নি। (সে কাঁদিয়া ফেলিল। নোট গুলি পড়িয়া গেল)।

হরিহর। নিতে চাস নি তবু তোর মুঠোর মধ্যে এসেছে—চমৎকার!

[অজিত হরিহরের সম্মুখীন হইল।]

অজিত। অপরাধী আমি, আমাকে শাস্তি দিন।

হরিহর। শাস্তি দেব, কিন্তু আমার বেত কোথায়?

অজিত। অমলা বার বার নিষেধ করেছে। আমি উপার্জন করি, তাই জোর করে তার হাত দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে শাস্তি দিন।

[অজিত বসিয়া পড়িয়া হরিহরের পায়ে ধরিল। ততক্ষণে সিদ্ধেশ্বরী, হরিশ, হারাণ, মণ্টু ও নন্তু আসিয়াছে সেখানে। হরিহর দুই হাতে জড়াইয়া তুলিলেন অজিতকে।]

হরিহর। তাই তো! তাই তো! ওরে, আজ না গুরুদক্ষিণা আজ না। তুই কাঁদছিস্? না না না। বড় বউ, হরিশ, তোমরা অজিতকে বোঝাও তার মাস্টার মশায় আত্মস্থ নেই। সে যে কাঁদছে। ওকে বল, যেদিন আমার শ্যামসুন্দর ফিরে আসবেন সেদিন দু'হাত ভরে তার হাত থেকে দক্ষিণা নেব। আজ নয়, আজ নয়।

[হরিহর দ্রুত ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বালিগঞ্জ। নিরঞ্জন রায়ের বাড়ী—দ্বিতলের ড্রয়িং রুম। নিরঞ্জন রায় আরাম কেদারায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। সহসা ফোন বাজিয়া উঠিল। নিরঞ্জন ফোন তুলিয়া লইলেন।]

নিরঞ্জন। ইয়েস!...করালী বাবু—? নমস্কার।...হ্যাঁ, হ্যাঁ,...আমার কোম্পানীতে? তা আপনি যখন বলছেন, তখন আপনার ভাইপোকে চাকরী একটা দিতেই হবে, সে তো আগেই বলেছি।......কিন্তু একটা পোস্ট তো ক্রিয়েট্ করতে হবে? সামনের মাস থেকেই হবে।...আপনারা হলেন মন্ত্রী ..আমরা তাঁবেদার, হুকুম মানতেই হবে।...কি?...হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়, অমনি বলছিলাম।...ওই চাঁদাটা? একশ টাকা পাঠিয়ে দেব .....আড়াইশ বড্ড বেশী নয় কি? বললে তো দিতেই হবে।......নমস্কার—ভাল কথা, চা খেতে কবে আসছেন? পরে জানাবেন? তাই ভাল?

[নিরঞ্জন রিসিভার রাখিলেন।]

চঞ্চলা। আমাকে কি দেখতে পেলে না?

নিরঞ্জন। হুঁ।

চঞ্চলা। তোমার দুশ্চিন্তায় বাধা দিতে আসি নি, এসেছি শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে।

নিরঞ্জন। তোমার দুশ্চিন্তাটি কি শুনি? দেহ সম্পর্কে?

চঞ্চলা। দেহ যা হবার তো হয়েছেই, আজকাল এদিকে দৃষ্টি দেবার তো তোমার সময় নেই? কেবল টাকা, টাকা, টাকা।

নিরঞ্জন। টাকা টাকা করি বলেই এমন দেহটা তুমি এখনও বহন করতে পারছ।

চঞ্চলা। ছিঃ ছিঃ, কি নির্লজ্জ! দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছি, খাবার রুচি নেই...

নিরঞ্জন। ভীম নাগের সন্দেশ আর দ্বারিকের রাবড়ি খাও বেশি করে, রুচি ফিরবে।

চঞ্চলা। কি খাব আর কি খাব না, তার উপদেশ তোমাকে দিতে হবে না। কবরেজ মশায়কে আনতে একবার মোটরখানা পাঠাবে?

নিরঞ্জন। কবরেজ মশায় কেন?

চঞ্চলা। কেন, শুনে কি করবে?

নিরঞ্জন। এ বেলা মোটর পাবে না।

চঞ্চলা। কেন, দুখানা তো আছে?

নিরঞ্জন। দুখানারই কাজও আছে।

[ভৃত্য একখানা কার্ড লইয়া আসিল। কার্ডখানা হাতে লইয়া নিরঞ্জন চঞ্চলাকে যাইতে ইংগিত করিলেন। হতাশার ভাব দেখাইয়া চঞ্চলা চলিয়া গেল। যাইবার কালে পর্দা ঠেলিয়া একজন তরুণী হাতে একটা ব্যাগ—প্রবেশ করিল। তরুণীর পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, মুখে হাসি, চোখে মুখে একটা রুক্ষতা। চুলগুলি সুবিন্যস্ত নয়, অবিন্যস্তও নয়। তরুণীর নাম অরুপা।]

অরুপা। নমস্কার!

নিরঞ্জন। বসুন। আপনার কথাই বুঝি অধ্যাপক হালদার বলেছিলেন?

অরুপা। হ্যাঁ। দেখুন, আপনারাই আজকার সমাজের চিন্তাশীল, জ্ঞানী লোক। আজ যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে বসে আছেন শুধু তাঁদেরই দোষে, দেশটা যে কিভাবে অধঃপতনের পথে চলেছে, এ কথা আপনারাই আমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন।

নিরঞ্জন। আমাদের অবস্থা শোচনীয়। বুঝি সব কিন্তু দেখাতে হয় যেন বুঝি না কিছুই। জানি ওরা ধনপতিদের চক্রে পড়ে দেশকে গোল্লায় দিচ্ছে, কিন্তু আমারও ধনের প্রয়োজন আছে বলে ওদের দলেও থাকতে হচ্ছে—কিন্তু তা' বলে কিছুই জানি না বুঝি না বলি কি করে?

অরুপা। ওদলে থাকুন বাধা নেই—বাইরে থাকবেন, কিন্তু অন্তরে হবেন প্রগতিশীল।

নিরঞ্জন। প্রগতিশীল? প্রগতি—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে আত্মরক্ষা ক'রে যতটুকু সম্ভব। তা আপনার প্রয়োজন কি বলুন?

অরুপা। এই আবেদনপত্রে দস্তখত, আর আমাদের নবনাট্য-সংঘে কিছু চাঁদা।

নিরঞ্জন। আবেদনপত্র? কিসের?

অরূপা। পড়ে দেখুন। বিদেশী দস্যুরা দুটি নিরপরাধ জীবন—

নিরঞ্জন। জানি, জানি। সব রকমের কুকার্যে ওরা ওস্তাদ। ওদের জীবন বাঁচাতেই হবে বৈ কি! এটমিক স্পাই! রাশিয়াকে যদি ওরা ওই তত্ত্ব দিয়েই থাকে, তবে পৃথিবীকে বাঁচিয়েছে। দস্তখত আমি—আচ্ছা, আমার স্ত্রীর নামটা দস্তখত করে দিই, আমি—বুঝেনই তো, না হয় আড়ালেই রইলাম। মার্কামারা হয়ে কাজ কি?

অরূপা। ও আর কে জানবে। দস্যুরা কি মানবে? তবে কি জানেন, আমাদের কাছে একটা রেকর্ড থাকবে, ভবিষ্যতে দিন এলে আমরা বুঝতে পারব কারা কি?

নিরঞ্জন। সত্যি বলেছেন। যদি একদিন আপনারা গদিতে বসে যান, তাহলে—হুঁ শত্রুমিত্রের একটা রেকর্ড থাকা ভাল। তা' দস্তখতটা দিয়েই রাখি।

[আবেদনপত্র লইয়া দস্তখত করিলেন।]

চাঁদাটা আপিসে গিয়ে নিতে হবে, ঠিক দুটোয় একবার যেতে পারবেন আপিসে?

অরূপা। নিশ্চয় পারব। যাওয়াই যে আমাদের কাজ। দুঃশাসনের শেষ যতদিন না হচ্ছে।

নিরঞ্জন। দুঃশাসন? বেশ শব্দটি জুটিয়েছেন। বর্তমানও আছে, ভবিষ্যতও আছে। দুর্যোধনই বা বাকি রাখেন কেন, উরুভংগ হবে?

অরূপা। যা' বলেছেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক আপনি।

নিরঞ্জন। আরও কথা হবে সেখানে, অনেক কিছু জানবার ও বলবার আছে। নমস্কার!

[অরূপা নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।]

নিরঞ্জন। রামরূপ!

[নেপথ্যে রামরূপ—"হুজুর!"]

নিরঞ্জন। ৯ চা।

[ফোনের বেল বাজিয়া উঠিল। নিরঞ্জন রিসিভার হাতে লইলেন।]

নিরঞ্জন। ইয়েস!...প্রফেসার ভট্চায্যি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইউ-এস-আই-এসের

ওখানে ছবি দেখার নেমন্তন্ন—মনে আছে। কি ছবি দেখাবে বলুন তো?... Behind the Iron Curtain? সে তো অনেক ব্যাপক...ও, ভাল, ভাল, Slave Labour Camp! খুব ভাল ছবি? ওরা, ওরা আবার প্রগতির গর্ব করে, যাব দেখতে, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। নমস্কার!

[ফোন রাখিয়া চাহিয়া দেখেন চঞ্চলা। রামরূপ চা আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে।]

নিরঞ্জন। আবার? এবার দেহ, না, মন?

চঞ্চলা। মন আমার নেই, দেহই যার যেতে বসেছে, মন দিয়ে তার কি হবে? আশ্চর্য! দিন দিন দেহটা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, খেতে পারছি না—

[বাইরে একটা কি যেন গোলযোগ—কে একজন জোর করিয়া ভিতরে আসিতে চাহিতেছে। রামরূপ বলিতেছে, "আগে তো হুকুম লিবেন? হুকুম না হ'লে হামি যেতে দিবেন না।" আর একজন বলিতেছে, "হুকুম? হাসালে তুমি! হামি যাবেন ব্রাদার—হট্ যাও।" পর্দা ঠেলিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল সত্যসুন্দর।]

সত্যসুন্দর। এই তো একেবারে যুগলরূপে উপস্থিত!

চঞ্চলা। ওগো!

নিরঞ্জন। রামরূপ! এই শালা শুয়ারকা বাচ্চা!

সত্যসুন্দর। ছিঃ ছিঃ, সম্বোধনটা ঠিক হ'ল না—ইনি আপত্তি করবেন। এই মহিলাটির কথা বলছি।

নিরঞ্জন। রামরূপ! ইডিয়ট—

সত্যসুন্দর। এবার ঠিক হয়েছে, গালাগালটা ইংরিজিতেই ভাল। শোনায়ও ভাল, সুরুচিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

নিরঞ্জন। (চঞ্চলাকে) ভেতরে যাও তো?

সত্যসুন্দর। তাই যান। আপনার দেহের দিকে চাইবার রায় মশায়ের এখন আর সময় হবে না।

[চঞ্চলা প্রস্থান করিল। রামরূপও চলিয়া গেল।]

নিরঞ্জন। স্টুপিড!

সত্যসুন্দর। স্টুপিড, একেবারে বাছাই করা সম্বোধন।

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সত্যসুন্দর। এতক্ষণ পরে এ প্রশ্ন? তাই তো, নিরঞ্জন রায় প্রশ্ন করছেন—আমি কে? নেবুতলার মেসের বারান্দায় শুয়ে আকাশের তারা গুণতেন যে নিরঞ্জন রায়, চারতলা বাড়ীর উপরতলায় বসে সেই নিরঞ্জন রায়ের পক্ষে আজ সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। নীচের দিকে তাকানো কষ্ট-কর। প্রশ্নটা স্বাভাবিক, সুন্দর এবং শিষ্টাচারসম্মত—তুমি কে?

[রামরূপ পর্দা ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে বামুন ঠাকুর এবং আরও তিন-চারজন চাকর]

সত্যসুন্দর। ব্রাদার-ইন-ল এবার সদলবলে এসেছেন—হুকুম করুন রায় মশায়, নিকাল দাও।

নিরঞ্জন। এই, তোমরা যাও।

[রামরূপ সকলকে লইয়া চলিয়া গেল।]

নিরঞ্জন। তুমি, তুমি কি—

সত্যসুন্দর। স্টুপিড।

নিরঞ্জন। তুমি সত্যসুন্দর?

সত্যসুন্দর। এত তাড়াতাড়ি চিনে ফেলাটা উচিত নয়। না না, বাড়ি করেছ, গাড়ী করেছ, অভিজাতদের একজন এখন, এ অবস্থায় এ রকমভাবে যাকে তাকে চিনে ফেলা যুগধর্মবিরোধী।

নিরঞ্জন। খুব বক্তৃতা করতে শিখে এসেছ!

সত্যসুন্দর। অনেক কিছু শিখে এসেছি। এবার যদি কোন কিছুতে হাত দিই, তাহলে সাফাই হাতে সেটা সারতে পারব। নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আর ধরা পড়ব না। জেল তো নয় যেন ট্রেনিং ক্যাম্প। অভিজ্ঞ কৃতবিদ্য অধ্যাপকরা সেখানে অধ্যাপনা করেন, হাতে-কলমে শিক্ষাও দেন। তাঁদের শিক্ষা লাভ করে সম্ভবতঃ তোমারই পুণ্যের ফলে ফিরে এসেছি। তা সজ্জনবর! চিনেই যখন ফেলেছ তখন তোমার রামরূপকে হুকুম দাও কিছু খাবার আর এক কাপ চায়ের জন্য। দু'দিন যাবৎ খুঁজছি তোমাকে,—পকেটে যা ছিল তা তো গেছেই, তার ওপর একটা টাকা উপার্জন করেছিলাম, তাও ফুঁকে দিয়েছি।

নিরঞ্জন। সে হবে। কিন্তু—

সত্যসুন্দর। কিন্তু আর নয়। রামরূপ, মাই ডিয়ার ব্রাদার-ইন-ল, অনুগ্রহ ক'রে—

[রামরূপের প্রবেশ।]

নিরঞ্জন। আমিই বলছি। এই, বাবুর জন্যে খাবার নিয়ে আয়—আর চা-ও।

সত্যসুন্দর। খাবার তিনগুণ, চা ডবল কাপ। তারপর—হ্যাঁ, যাও ব্রাদার-ইন-ল, হনুমানগতিতে যাবে আর আসবে।

নিরঞ্জন। সত্যসুন্দর! তোমাকে ভদ্রস্থ হতে হবে। এ সাজ পোষাক, চেহারা ছবি—

সত্যসুন্দর। তা মন্দ বলনি, যে সমাজে বাস করে এলাম সেখানকার পোষাক-পরিচ্ছদ তোমাদের সমাজে চলবে কেন? বদলাব ভাই, ভোল বদলাব। তোমার আদর্শ অনুসরণ করব। অতীতেও গুরুজীর কৃপা বহন করে দশটি বছর ঘানি টেনে এলাম, এখনও তোমারই কৃপায়—

নিরঞ্জন। থাম।

সত্যসুন্দর। সুরটা যেন আদেশের বলে মনে হচ্ছে! গুরুজীই বটে। ...আরে, দেয়ালে যে দেখছি, গান্ধীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছ? না, তুমি মহা-পুরুষই বটে, পায়ের ধুলো দাও ভাই। বাজীকর, তুমি বাজীকর। সব শুনব, সব কথা শুনব। তারপর...হ্যাঁ, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই, চমৎকার সিগারেট, রেড এণ্ড হোয়াইট। বিড়ি টেনে আর খইনি চিবিয়ে চিবিয়ে—উঃ, সিগারেট কি বস্তু তা তো ভুলেই গেছি। নেবুতলার সেই মেসে মাঝে মাঝে পাসিংশো হাতে পেলে নিরঞ্জন রায় আর সত্যসুন্দর চক্রবর্তী আনন্দে নৃত্য করতো।

নিরঞ্জন। কথা থামাও এবার। সবাই শুনে ভাবছে কি বল দেখি?

সত্যসুন্দর। (সিগারেট ধরাইয়া) কিচ্ছু ভাববে না ভায়া। তোমাকে কতটুকু জানে এরা, আর আমার কথাই বা কতটুকু জানবে? ব্যাসদেব তো নই, মহাভারত রচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এমন যে মহাভারত, তাতেও তো তোমার চরিত্র খুঁজে পাচ্ছি না?

নিরঞ্জন। কি বলতে চাইছ তুমি?

সত্যসুন্দর। বলছি, গান্ধীর ছবি রেখেছ ওদিকে, আমার একটি ছবি টাঙিয়ে দাও এদিকে। একবার ওদিকে প্রণাম জানাবে আর একবার এদিকে। দুনিয়ায় সত্য আর মিথ্যা, গান্ধী আর সত্যসুন্দর পাশাপাশি বাস করে।

নিরঞ্জন। দেখ সত্যসুন্দর! এটা বাচালতার স্থান নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে যারা বাস করে—

সত্যসুন্দর। থামলে কেন, বলে যাও—এখানে যারা বাস করে, তারা সব সত্যিকার সত্য ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি। আর বাবা মা আমার নাম সত্যসুন্দর রাখলেও আসলে আমি মিথ্যা ও অসুন্দর। এই তো বলতে চাও? কিন্তু ভ্রাতঃ, আমি নেহাৎ বাচালতা করবার জন্যে এখানে আসিনি, এটা তুমি বুঝতেই পারছ। বুদ্ধির তোমার অভাব ঘটেছে একথা মনে করি না। প্রথমে জানতে চাই—

নিরঞ্জন। জানাজানি পরে হবে, এখনি তুমি আবার জেলে চলে যাচ্ছ না তো!

সত্যসুন্দর। কি জানি, তোমরা এখনি আবার পাঠাতে পার।

নিরঞ্জন। আমার এখন অনেক কাজ সত্যসুন্দর।

সত্যসুন্দর। আমিও আর নিষ্কর্মা বসে থাকতে পারি না, আমাকে হয়তো ত্রিভুবন তোলপাড় করতে হবে। আমার তাই এখনি জানা প্রয়োজন—

নিরঞ্জন। না, এখন কোন প্রয়োজন নেই।

[রামরূপ খাবার ও চা লইয়া আসিল।]

নিরঞ্জন। খাবার এসেছে, বসে বসে খাও। এবার আমি ওপরে যাচ্ছি।

সত্যসুন্দর। দাঁড়াও।

[যাইবার পথে তাহার হাত হইতে সিগারেটের টিনটা সত্যসুন্দর ছিনাইয়া লইল। নিরঞ্জন ত্বরিৎগতিতে বাহির হইয়া গেল। সত্যসুন্দর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

সত্যসুন্দর। ভয় পাও কেন বন্ধু! তুমি অভিজাত, অর্থশালী—আর আমি জেল-ফেরৎ দাগী আসামী। ভয় কেন?

[সত্যসুন্দর বসিয়া খাবার খাইতে লাগিল। এমন সময় সেখানে আসিয়া

প্রবেশ করিল অজিত। সে আসিয়া দেখে, তাহারই বাবার আরাম-কেদারায় বসিয়া খাবার খাইতেছে সত্যসুন্দর। অজিতকে দেখিয়া সে বাঁকা চোখে একবার চাহিল। অজিত হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যসুন্দর একটা সিগারেট ধরাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।]

অজিত। তুমি—তুমি—

সত্যসুন্দর। কাকাবাবু বলতে পার। তোমার বাবা আর আমি দুজনে মাসতুত ভাই। বিদেশে ছিলাম, ফিরে এসেছি।

অজিত। মনে হচ্ছে শেয়ালদায়—

সত্যসুন্দর। আমাকে? নিশ্চয় দেখেছ। একটা টাকাও দিয়েছ। আমি তোমাকে চিনেও ছিলাম, চিনিও নি। নিরঞ্জন রায়ের ছেলে......তা ও সব থাক্ বাবাজীবন, মাস্টার মশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলে, এই হয়তো ফিরে এলে। ওপরে যাও, বাবাকে পাঠিয়ে দিও, বলো—কাকাবাবু অপেক্ষা করে আছেন। আমার সঙ্গে আরো কতো দেখা হবে, নিত্য দেখা হবে।

[নিরঞ্জন রায়ের প্রবেশ।]

নিরঞ্জন। খাওয়া শেষ হয়েছে, এবার বিদেয় হও তো।

অজিত। এ কে বাবা?

নিরঞ্জন। একটা লোফার, ভ্যাগাবণ্ড।

সত্যসুন্দর। আর কিছু নয়? বল না। এখন বড় চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে, মনে হচ্ছে যেন একটা বীভৎসতা মূর্তি ধরে এসেছে—

নিরঞ্জন। থাম। বেরিয়ে যাও বলছি। আর এক মুহূর্তও না।

সত্যসুন্দর। তোমার বাবাকে এ রূপ সংবরণ করতে বল অজিত। বড়ো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

নিরঞ্জন। গেট আউট, গেট আউট রাসকেল।

সত্যসুন্দর। চমৎকার! এবার রাসকেল! মহাপুরুষ, এবার বল দেখি আমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়?

নিরঞ্জন। স্ত্রী-পুত্র? উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ। পুলিশ ডাকতে হবে দেখছি।

[ফোনের দিকে আগাইয়া গেল—সত্যসুন্দর দুই হাত প্রসারিত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। অজিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।]

অজিত। বাবা! তুমি ওপরে যাও, আমি দেখছি।

নিরঞ্জন। জানিস না, জানিস না অজিত এ উন্মাদকে এখুনি তাড়াতে হবে। নইলে—

সত্যসুন্দর। বল, বল নইলে কি? যা জানে না, তাই জানাও। না হয় অনুমতি কর তো আমিই বলি। শুধু মুখেই বলব, না, দলীল-দস্তাবেজও—

নিরঞ্জন। না, না, না। (কাঁপিতেছিল)

[সত্যসুন্দর হাসিয়া উঠিল।]

অজিত। যাও, যাও, তুমি এখান থেকে যাও।

সত্যসুন্দর। তুমিও বলছ? আশ্চর্য—আজকার যুগের তরুণ, প্রগতিশীল, বুদ্ধিমান বাঙালী তুমি, বলছ আমাকে—যাও। তুমিও মনে কর আমি উন্মাদ?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, তুমি উন্মাদ।

অজিত। তুমি উন্মাদ।

সত্যসুন্দর। উন্মাদ? এখন বল নিরঞ্জন রায়, তোমার উত্তর পেলেই আমি চলে যাব। আপাতত—বল, আমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়?

অজিত। তোমার স্ত্রী-পুত্র?

নিরঞ্জন। আমি বলব তোমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়?

সত্যসুন্দর। তুমি, তুমি, তুমি। তুমি পুলিশ ডাকবে? ডাক নিরঞ্জন রায়। আমার যে অস্ত্র আছে—তা আমিও প্রয়োগ করব। নেবুতলা মেসের ভজহরি এখনও বেঁচে আছে। হয় পুলিশ ডাক, না হয় বল—আমরা স্ত্রী-পুত্র কোথায়? আমি স্ত্রীকে চাই আমার ছেলেকে চাই, আমার টাকা চাই—নিরঞ্জন, কথা বল।

[বাড়ীর প্রায় সকল লোক আসিয়া সমবেত হইয়াছে।]

নিরঞ্জন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। ওরে, তোরা বের করে দে একে। অজিত, একে আমি জানতাম না, জানি না, আমার কেউ নয় এ—বন্ধু নয়, কেউ নয়।

[নিরঞ্জন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।]

সত্যসুন্দর। ভেঙে পড়লে বন্ধু! তোমাকে মানায় না। তোমরা কি জোর করে বের করে দেবে? তাই কর, তাই কর।

অজিত। না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন কাকাবাবু।

সত্যসুন্দর। কাকাবাবু! ব্যঙ্গ করলে, না, সত্যি ডাকলে?

অজিত। হ্যাঁ, সত্যি ডাক্‌লাম। আমি বুঝেছি সত্যিই আপনি আমার বাবার বন্ধু।

সত্যসুন্দর। তাই, তুমি স্বীকৃতি দিলে?

অজিত। শুধু স্বীকৃতিই দিলাম না, প্রতিজ্ঞা করলাম—কাকীমাকে আর ভাইটিকে আমি খুঁজে বের করব।

নিরঞ্জন। (আর্তকণ্ঠে) অজিত! অজিত! এমন প্রতিজ্ঞা করিস নে।

অজিত। আসুন কাকাবাবু। যদি আপনার প্রতি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, বাবা যদি কোন—সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমি —

নিরঞ্জন। না রে না, প্রতিজ্ঞা করিস না, তুই যে আমার ছেলে--

অজিত। আমি মাস্টার মহাশয়ের ছাত্রও। মানুষই আমার আসল পরিচয় বাবা।

সত্যসুন্দর। ভগবান ব'লে একজন তাহলে সত্যি আছেন, আর তাঁর পৃথিবীতে শুধু সত্যসুন্দর নিরঞ্জনই নেই, মানুষও আছে?

বিরাম—যবনিকা

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[এক মাস পর। হরিহর মাস্টারের বাড়ী। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন বাহিরে দাঁড়াইয়া, স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী বসিয়াছিলেন ঘরের মধ্যে। তিনি ঘরকন্নার কি কাজ করিতেছিলেন।]

হরিহর। তোমরা ছাত্র, অধ্যয়নই তোমাদের তপ। শুধু তাই নয়, আজ ইতিহাস তোমাদের এনে এমন এক সময়ে উপস্থিত করেছে, যখন জীবনেব, জাতির সমস্ত ভিত ধ্বসে পড়েছে তোমাদের, তোমরা—পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের কথা বলছি। তোমাদের আজ নিতে হবে প্রতিষ্ঠার শিক্ষা, সে শিক্ষায়ই করবে মনকে একাগ্র। আজকের যুগে বিভ্রান্তির অন্ত নেই, ছেলেদের মাথা-খেকোর দল সর্বত্র ওঁৎ পেতে বসে আছে। মনে রেখো, দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন স্বাধীনতার জন্যে ত্যাগের প্রয়োজন ছিল, লেখাপড়া তখন স্থগিত থাকার একটা যুক্তি ছিল—কিন্তু আজ স্বাধীন দেশে প্রাপ্ত-বয়স্করা অধিকার পেয়েছে। তারাই দেখবে কোন্ মতে আর কোন্ পথে গড়ে তুলবে দেশকে। তাদের দ্বন্দ্বে তোমাদের কোন স্থান নেই, প্রয়োজন নেই। তোমরা নিজেদের গড়ে তোল—এই সত্য মনে রেখে গড়ে তোল যে, তোমাদের নাম আজ বাস্তুহারা—শুধু বাস করবার বাস্তুই নয়, তোমাদের জীবনের বাস্তু যে ধর্ম, সে ধর্মের মূল পর্যন্ত উপড়ে গেছে। তাই আজ ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার মহালগ্নের জন্যে তোমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। এ তোলায় চাই নিষ্ঠা, তপস্যা, সাধনা—বুঝলে বড় বউ? সবগুলি ছাত্র খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে আমার কথা।

[সিদ্ধেশ্বরী বাহির হইয়া আসিলেন।]

সিদ্ধেশ্বরী। একটা কথা বল্‌ব, বল রাগ করবে না?

হরিহর। রাগ? কেন রাগ করব বড় বউ? বল, কি বল্‌বে?

সিদ্ধেশ্বরী। আমরা দেশে নেই, যা আমাদের ছিল সব হারিয়ে এসেছি। এখানে আমাদেরও প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্যে চেষ্টা করার। তাই বলছি, তুমি ওসব ছেড়ে সেই চেষ্টাই দেখ।

হরিহর। কি তুমি বলতে চাও ঠিক বুঝলাম না বড় বউ?

সিদ্ধেশ্বরী। বলতে চাই, তুমি পড়ানর কাজ নিয়েছ, এসব বক্তৃতা আর উপদেশ নাই বা দিলে? কলকাতার আবহাওয়া আমি যতটুকু দেখি, তা'তে মনে হয় তোমার উপদেশ শোনবার জন্যে কেউ বসে নেই?

হরিহর। কিন্তু, শিক্ষকের কর্তব্য তো শুধু বইএর পাঠ দেওয়া নয়, ছেলেদের সত্যপথ দেখিয়ে দেওয়া, তাদের চরিত্র গড়ে তোলাও। আমি আমার শিক্ষকের ধর্ম বিসর্জন দেব?

সিদ্ধেশ্বরী। দেশ ছাড়ার পর এ নূতন দেশে—

হরিহর। আমরা নূতন মানুষ আর নূতন সভ্যতার মাঝে এসেছি? হয়তো তাই মনে হয়। চোখে ধাঁধা লাগে। এই আমাদের নিরঞ্জন রায়। অজিতের বাবা। দেশের লোক—অজিতের খবর পাবার পর গিয়েছিলাম একদিন। তোমরা জান না, কি ব্যথা নিয়ে এসেছি সেদিন। টাকা-পয়সা হ'লে মানুষ বদ্‌লে যায়, আত্মা হারিয়ে ফেলে শুনেছিলাম—নিরঞ্জনে তা' দেখলাম। মনে মনে বলে এলাম, ভগবান কখনো যেন আমাদের ধন না দেন। শ্যামসুন্দরের কাছে প্রার্থনা করলাম—আমাদের গরীব রেখো ঠাকুর।

সিদ্ধেশ্বরী। উনি তো খুব ভালো মানুষ ছিলেন।

হরিহর। এখন বড়ো মানুষ। ভালো মানুষের ছেলেকে জামাই করতে চেয়েছিলে কিন্তু তা' আর হবার নয়। কি জান বড় বউ, আমার কাছে নিরঞ্জন যা', সমাজের কাছে তা' নয়। তাই আমি কি চাই জান, অন্ততঃ দু'টি ছেলেকেও যদি মানুষ তৈরী করে যেতে পারি আর পারি আবার...... শক্তি কি পাব না, দেবেন না আমার শ্যামসুন্দর?

[দূরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।]

হরিহর। ওই বাজে—বাজে, সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজে। আমার ঘরেও বাজত, আজ আর বাজে না।

[হরিশ প্রবেশ করিল।]

হরিশ। বাবা! বাবা!

হরিহর। শুনছিস্ হরিশ, ওই শঙ্খঘণ্টা বাজছে!

সিদ্ধেশ্বরী। ওগো, তুমি থাম। শ্যামসুন্দর সব জায়গায়ই আছেন —ঘরে ঘরে মূর্তি ধরে নাই বা থাকলেন। নাই বা বাজল সব জায়গায় শঙ্খ-

ঘণ্টা। তুমি উতলা হয়ো না।

হরিহর। আমার মনের কথা তোমরা হয়তো আজও বুঝতে পারলে না। ওরা যে আমার ঠাকুরকে কেড়ে নিয়ে গেল? তুইও পারিস নি হরিশ?

হরিশ। পেরেছি বাবা! আমাদের শ্যামসুন্দরকে আবার আমরা প্রতিষ্ঠা করব, তাঁর মন্দির গড়ব। আমরা ভারতের, বাংলার হিন্দু—আমরা মানুষ।

হরিহর। হ্যাঁ, আমরা উদর নিয়ে শুধু বেঁচে নেই, ধর্ম নিয়ে বেঁচে আছি। আমাদের যেমন কলকারখানা আছে, আপিস-আদালত আছে, তেমনি তারই পাশাপাশি আছে মঠ, মন্দির, তীর্থস্থান। তুই পারবি হরিশ, তুই এ জ্ঞান পেয়েছিস?

হরিশ। এই নাও বাবা, আজ মাইনে পেয়েছি।

[হরিশ কয়খানা নোট বাবার হাতে তুলিয়া দিয়া মা-বাবার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। ঠিক এই সময়ে হারাণও প্রবেশ করিল। হাতে একটি ঝুলি।]

হারাণ। শুধু তুমিই বুঝি দিগ্বিজয় করে এলে দাদা! আমি রাজ্য জয় না করলেও—

হরিশ। হারাণ, বাবা তোমার সম্মুখে।

হরিহর। বলতে দে, বলতে দে হরিশ। হারাণ আজকের দিনে না হয় একটু বাচালতাই করুক—এটা তার স্বভাব।

হারাণ। আমি বাচালতা করি বাবা? টু দি পয়েণ্ট ছাড়া কথা আমি বলি না। আমাদের ফ্যাক্টরীর মালিক একদিন ডেকে বললেন, হারাণ, তোমার মতো মুখ বুজে কাজ করার মানুষ যদি পাঁচজন পেতাম, তাহলে এতদিনে কলকাতার বাজার আমার প্রোডাকশনে ছেয়ে যেত। আমি বললাম—

হরিহর। শুনব রে, তোর টু দি পয়েণ্ট কথা সব শুনব। ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধো—

সিদ্ধেশ্বরী। তাই চল্ হারাণ, হরিশ তুইও চল্।

হারাণ। বাঃ, তোমাদের প্রণাম করব না বুঝি?

হরিশ। তাই কর্ কিন্তু মুখ বন্ধ করে।

হারাণ। তা বলে তোমাকে করব না—(বাবার দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল) বুঝলে দাদা, আমাকে আজ দিলে ৫২৸৶৬!

হরিশ। আবার?

[হারাণ বাবাকে ও মাকে প্রণাম করিয়া টাকাগুলি বাবার পায়ের কাছে রাখিল। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া হঠাৎ দাদার পায়ে হাত দিয়া একটা প্রণাম করিতেই হরিশ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।]

হরিহর। যাও, যাও বড় বৌ, তুমি ছেলেদের দেখ।

সিদ্ধেশ্বরী। তুমিও ভেতরে চল।

[হরিহর ও সিদ্ধেশ্বরী ভিতরে গেলেন। অমলা প্রদীপ লইয়া আসিল তুলসীতলায় দিতে। প্রদীপ দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। বাহির হইয়া আসিলেন সিদ্ধেশ্বরী ও হরিশ।]

হরিশ। বাবাকে বলতে সাহস করি নি, ওই চাকুরীতে বেতন পাওয়া আজই আমার প্রথম এবং শেষ।

সিদ্ধেশ্বরী। কি বললি? প্রথম এবং শেষ?

হরিশ। হ্যাঁ, আজই সংঘর্ষ হয়ে গেল। উনি এমন সব কথা দিয়ে তাঁর বক্তৃতা সাজিয়ে দিতে বললেন, তা আমার পক্ষে লিখে দেওয়া অসম্ভব। আমি লিখব, ভারতবর্ষের অতীত ছিল সত্যিকার মানবতাবোধরহিত—তার ধর্ম, সাহিত্য, তার দর্শন সব কিছু গড়ে উঠেছে রাজারাজড়া, বিত্তশালীর দিকে চোখ রেখে, সাধারণ মানুষকে উপলক্ষ করে নয়। বিদেশীরা নাকি আমাদের মানুষকে চিনবার মন্ত্র দিয়েছে, মানবতা শিখিয়েছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের দেশের মানুষ এ মিথ্যা সইতে পারে না, তাই প্রতিবাদ করলাম। তিনি বললেন, যারা তাঁকে প্রগতি সংস্কৃতি সংঘে বক্তৃতা দিতে ডেকেছে তারা এ রকম বক্তৃতাই চায়। কে কি চায় না-চায় জানি না, কিন্তু আমি যা সত্য বলে জানি না, মানি না, তাই নিয়ে বক্তৃতা রচনা করব? টাকার বদলে আমার বিবেকবুদ্ধি বিকিয়ে দেব? কাজেই চাকরীতে আজই ইতি হয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী। এত কথা আমি বুঝি না। কিন্তু যে আশা তাঁর মনে জেগেছিল তা ভেঙে যাওয়ার আঘাত তিনি সইবেন কি করে?

হরিশ। চিন্তা কি মা?

[হারাণ একটা মোয়া খাইতে খাইতে বাঁ-হাতে জলের গ্লাস লইয়া প্রবেশ করিল। সে হরিশকে ইঙ্গিত করিল—তাহার বক্তব্য ছিল, তাহা বলিবার জন্য উস্‌খুস করিতেছে। কিন্তু নেহাৎ মুখটা ব্যস্ত তাই চুপ করিয়া আছে।]

হরিশ। কাল থেকে আমি খবরের কাগজ ফিরি করতে বেরুব। দেহে শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, উপার্জন আমি যে-কোন ভাবেই করতে পারব।

[হারাণ হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। তারপর জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া বলিল।]

হারাণ। দাঁড়াও। তুমি উপার্জন করবে খবরের কাগজ বিক্রি করে? পারবে না, পারবে না। কেন পারবে না বুঝিয়ে বলছি। পারবে না তুমি এ যুগের মানুষ নও ব'লে। চাকরী করবে, তাতে আবার বিবেক-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ এ সব বালাই কেন? এ যুগে পৃথিবীর কোথাও সেটা নেই—থাকতে নেই।

হরিশ। এই তো বক্তৃতা সুরু করে দিলি!

হারাণ। তোমাদের একটা দোষে দাঁড়িয়েছে, আমি কিছু বললেই বলবে—বেশী কথা বলি। উদ্দেশ্য তো আমার কথাগুলোকে চাপা দেওয়া। কিন্তু আমি টু দি পয়েণ্ট ছাড়া কথা বলি না।—তা ছাড়া দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে আমার জ্ঞান এ এক মাসে অনেক বেড়েছে।

সিদ্ধেশ্বরী। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না হরিশ। তবে চাকরী ছেড়ে এসেছিস একথাটা ওঁকে আজই জানাস নে।

[সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া গেলেন।]

হরিশ। তাই করব মা, কিন্তু কাল তো মিথ্যা বলে তাঁকে ফাঁকি দিতে পারব না।

হারাণ। না, ফাঁকি দিতে পারবে না। কেন পারবে? যা বলছিলাম, আমার জ্ঞানের কথা বলি দাদা। আমাদের ফ্যাক্টরীতে কর্মী আমরা সাড়ে তের-জন। তেরজন পুরো মানুষ, একজন অর্ধেক মানুষ, অর্থাৎ দুটি পা-ই তার নেই—কেটে ফেলে দিতে হয়েছে। সেই সাড়ে তেরজন মানুষের আমাদের একটা ইউনিয়ন সম্প্রতি গড়ে উঠেছে সাউথ সুবারবান প্ল্যাষ্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং

ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। আমাদের ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড দিঘাপাতিয়া বলেন, মেহনতী জনতার সাড়ে তেরজন মানে সাড়ে তের লক্ষ। একতার উপরই নির্ভর করে আমাদের বেঁচে থাকা। আমরা তাই বেঁচে থাকবার জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছি। মালিক শুনে বলেছেন—এরই মধ্যে এত? ব্যাস, আমি না হয় বন্ধই করে দেব কারখানা। লোকসান দিয়ে চলছি, কমাস হ'ল শুরু করেছি মাত্র। কমরেড দিঘাপাতিয়া বলেন, বললেই হ'ল আর কি? বন্ধ করতে আমরা দোব না। তাই আমরা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুত হচ্ছি সাড়ে তেরটি সৈনিক পাঁচ হাজার টাকা মূলধনের শিল্পপতি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।

হরিশ। (মাঝখানে বাধা দিয়া) টু দি পয়েণ্ট একটা কথা জানতে চাইছি হারাণ, কমরেড দিঘাপাতিয়া নামের অর্থটা কি?

হারাণ। দিঘাপাতিয়া নামটি আমাদের দেওয়া। উনি নাকি দিঘা-পাতিয়ার বংশেরই একজন দূরতম রক্তধর। এই তথ্যটা তিনিই জানিয়েছেন।

হরিশ। রক্তধর আবার কি?

হারাণ। বংশধর নয়, রক্তধর—এ কথাটা বুঝলে না। মাঝে মাঝে এজন্যেই বেশি কথা বলতে হয়। তা—

[অমলা ও অজিত প্রবেশ করিল, হারাণের কথায় বাধা পড়িল।]

অমলা। দাদা! এতদিনের পর—

হারাণ। থাম্ আমি শেষ করে নিই কথাটা।

অমলা। তোমার কথার কি শেষ আছে? এক মাস অজিতদার খবর নেই, জান তো বাড়িতেও যান না। আজ আমি এই কাজগুলো জুটিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে ফিরছিলাম। দেখি, একটা বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, এই চোখ-মুখ, এই চেহারা—চিন্‌তেই পারি নি প্রথমে—

হারাণ। নেহাৎ অন্তরের—

অমলা। থাম। এক রকম ধরেই নিয়ে এসেছি। এবার জিজ্ঞাসা ক'রে নাও দাদা, ব্যাপার কি? আমি কাজগুলো ভেতরে রেখে আসি।

[অমলা চলিয়া গেল।]

হারাণ। ব্যাপার আবার কি হবে—হয়তো বৈরাগ্য অথবা বিরহ। কিন্তু দাদা! আমি বলছি, তোমার দ্বারা কাগজ বিক্রিটিক্রি কিছু হবে না। তার

চেয়ে বরং একটা ধর্ম ও নীতি-উপদেশের ক্লাস খুলে দেখ, যদি ছাত্র জোটাতে পার। আসছি ভাই অজিত, মার ভাঁড়ারে আর একটা মোয়া পাওয়া যায় কি না দেখে আসি। ততক্ষণ—

হরিশ। তুমি ভেতর থেকে ঘুরে এস।

[হারাণ প্রস্থান করিল।]

হরিশ। তারপর অজিতচন্দ্র, ব'স হে। বসে বল দেখি, ব্যাপারটা কি?

অজিত। কিসের ব্যাপার?

হরিশ। কেন গৃহত্যাগ? কোথায় থাকা হয়, কি করা হয়?

অজিত। তোমরা দেশত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছ, আমিও গৃহ-ত্যাগ করতে বাধ্যই হয়েছি। এর বেশি এখনই কিছু জানতে চেয়ো না হরিশদা।

হরিশ। উত্তম। বাকি দুটো প্রশ্নের উত্তর?

অজিত। থাকি নিশ্চয়ই লোকালয়ে, আর কাজ করি যা করতাম। তা ছাড়া—

হরিশ। তা ছাড়া? থামলে কেন?

অজিত। একটি মেয়ে আর একটি ছেলেকে খুঁজে বেড়াই।

[বাইরে সতসুন্দরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—"বাড়ীতে কে আছেন—মাষ্টার মশায়ের বাড়ী না?"]

হরিশ। কে? কাকে চান? এটাই মাস্টার মশায়ের বাড়ি।

[সত্যসুন্দর—"আসতে পারি কি?" সত্যসুন্দর প্রবেশ করিল।]

সত্যসুন্দর। অনুমতি নেবারই বা প্রয়োজন কি? অজিত! তা হ'লে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়ই এসেছি। এক মাস, এক মাস তুমি ঘুরছ, আমিও ঘুরছি।

অজিত। বৃথাই হয়েছে কাকাবাবু, ওদের খুঁজে পাই নি এখনও। হয়তো সারাটি জীবন আমাকে ঘুরতে হবে—

সত্যসুন্দর। হবে না, হবে না অজিত। তুমি কি মাস্টার মশায়ের ছেলে? আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছ? থাকবারই কথা। আরও খটকা লেগেছে, অজিত বলছে—কাকাবাবু। আমি কে, না জানাই ভাল। এখন বিস্মিত হচ্ছ, তখন হয়তো পরম আনন্দে চিৎকার করে উঠবে। আমি

সমাজের একটা মূর্তিমান বিগ্রহ। দশ বছর জেল খেটে আসার আভিজাত্য আছে আমার।

হরিশ। দশ বছর জেলে ছিলেন?

সত্যসুন্দর। একটানা দশ বছর। ভাবছি 'শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্‌' অথবা 'পাষাণপুরীর অন্তরালে' এমনই নাম দিয়ে একখানা বই লিখব। লিখতে জানি, লিখতে জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেহাৎ অকৃতি ছাত্র ছিলাম না। কি বলে আরম্ভ করব, তাও একরকম ঠিক ক'রে রেখেছি। শোনই না। দুটি বন্ধু থাকতাম নেবুবাগানের একটি মেসে। একজন করত স্পেকুলেশন, আর একজন করত ক্যালকুলেশন। অর্থাৎ একজন যেত ফাটকার বাজারে আর একজন করত একটি বড় ব্যাংকের চাকরি।

অজিত। কাকাবাবু!

সত্যসুন্দর। ওঃ, না না, অজিত, আর বল্‌ব না। কি জানি যেন মাথার যন্ত্রগুলো বিগড়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে...ভয় নেই। কিন্তু অজিত—

অজিত। চলুন কাকাবাবু, আমরা যাই।

হরিশ। এখনই যাবে কি বলছ অজিত? অমলা তোমাকে ধ'রে নিয়ে এল—

[অমলা নন্তুর হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল।]

অমলা। আমার দেরি হয়ে গেল অজিতদা,—বাবার জেরা আছে তার ওপর নন্তুবাবুর আব্দার। তা মা চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছেন।

সত্যসুন্দর। তুমি অমলা? আর নন্তু—নন্তু—এস না খোকা, আমার কাছে একবার?

নন্তু। না না। এ কে দিদি?

সত্যসুন্দর। ভয় পেয়েছ? পাবে না কেন? কিন্তু এমনই একটি খোকা—সে ভয় পেত না, সে জড়িয়ে ধরত এসে আমাকে।

অজিত। কাকাবাবু!

সত্যসুন্দর। তাই তো, আমি বিচলিত হচ্ছি। তুমি—তুমি খোকা, বেশ করেছ, সত্যি আমার কাছে আসতে নেই। আমি একটা জীবন্ত অভি-

শাপ,, আমি কুৎসিত, আমি পাপ। অজিত, সত্যি, আমি কেন বিচলিত হই। দশ বৎসরের শিক্ষা—আশ্চর্য!

অজিত। আজ আসি অমলা। হরিশদা! আর একদিন নিশ্চয়ই সব জানবে—বুঝতে পারবে কি অভিশাপ মাথায় নিয়ে আমাকে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে? কিন্তু এখন নয়। আসুন কাকাবাবু।

নন্তু। যাব দিদি ওঁর কাছে? উনি যে কাঁদছেন!

সত্যসুন্দর। কাঁদছি? না খোকা, না। শুধু তোমাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তুমি পবিত্র, মাস্টার মশায়ের ছেলে, স্বর্গের দেবশিশু—আমি তোমাকে স্পর্শ করব না।

অমলা। যাও না নন্তু। তোমার অজিতদার যখন কাকাবাবু, তখন আমাদেরও কাকাবাবু।

সত্যসুন্দর। না, না, না।

নন্তু। কাকাবাবু তো এমন করছেন কেন?

সত্যসুন্দর। এমন করছি কেন? তোমাকে দেখে যার কথা মনে হয়েছিল, আসলে সে যে আর নেই।

অজিত। সে আর নেই জানতে পেরেছেন?

সত্যসুন্দর। দেখতে পেয়েছি। ঠিক সেই। আজ কি হয়েছে জান, সে এসেছিল আমার পকেট কাটতে—চোরের ছেলে পকেটমার সেজেছে। আর তার মা! তাকেও দেখেছি—কোথায়, কি ভাবে বলব না, বলব না! তোমরা সভ্য সমাজের মানুষ, শুনে লজ্জায় ঘৃণায়—

[হরিহর প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। কে, কে এমনভাবে কথা বলে? কে তুমি?

সত্যসুন্দর। আমি? আমি কে?

হরিহর। তোমাকে দেখেছি। কোথায় দেখেছি বল দেখি?

দত্যসুন্দর। দেখেছেন, আজও দেখছেন কিন্তু আমাকে জানেন নি। অজিত, চল, এখান থেকে পালিয়ে যাই—ওই দৃষ্টির সামনে আমার দাঁড়াবার সাধ্যি নেই—পালিয়ে চল।

[অজিতকে টানিয়া লইয়া সত্যসুন্দর চলিয়া যাইতে লাগিল।]

হরিহর। দাঁড়াও অজিত।

[সত্যসুন্দর আর অজিত প্রস্থান করিল।]

হরিহর। অদ্ভুত!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাস্তা। অমলা ও মণ্টু। অমলার হাতে কয়েকটি জামা। মণ্টুর হাতে ঠোঙা]

মণ্টু। বুঝলে দিদি, আমাকে একটা নেশায় পেয়ে বসেছে।

অমলা। কিসের নেশা মণ্টু?

মণ্টু। এই কাজের নেশা। একটা কিছু করে যাতে দু'পয়সা পাই।

অমলা। কিন্তু বাবা রাগ করেন। তোকে এখন পড়াশুনো করতে হবে।

মণ্টু। পড়ার কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে দিদি। কতো কিছু ভাবতাম, পাশ দেব—প্রতিযোগিতা করব। কিছুই হ'ল না! কিন্তু এখন আবার ভাবি, এত পড়াশুনো ক'রে দাদার কি হ'ল? পথে পথে কাগজ বিক্রী করে বেড়াচ্ছে তো!

অমলা। তবু জ্ঞান অর্জন করেছেন দাদা।

মণ্টু। আমিও অজ্ঞান নই দিদি। তা ছাড়া বাবার নতুন স্কুলে তো হাজিরা দিচ্ছি। এই যাঃ, পথ কি ভুল করলাম? তুমি কত নম্বরে যাবে না?

[অরুপার প্রবেশ]

অরুপা। দেখুন—কিছু মনে করবেন না! আচ্ছা, আপনি কি উদ্বাস্তু?

অমলা। কেন বলুন দেখি?

মণ্টু। কই, এমন কোন চিহ্ন তো আমাদের নেই?

অরূপা। অনুমান বা সন্দেহ—যাই বলুন। আপনার হাতে এই নতুন কাপড়ের তৈরী জামাগুলো দেখে, আর এই ছেলেটির হাতে সব ঠোঙা—

মণ্টু। মন্দ নয়! এগুলো আমরা কিনেও তো আনতে পারি?

অরূপা। কিন্তু কিনে আন নি, সত্য নয় কি? তোমার দিদিই বলুন? দিদিই তো উনি?

অমলা। হ্যাঁ, ভাই, আমরা উদ্বাস্তু।

অরূপা। বাড়ি কোথায় ছিল?

অমলা। খুলনা জেলায়। আপনিও কি উদ্বাস্তু?

অরূপা। উদ্বাস্তু বইকি, ভারতে কে উদ্বাস্তু নয় বল দেখি? ভারতের সত্যিকার মানুষ যারা তাদের কারোই বাস্তু নেই।

মণ্টু। বলেন কি? তা হ'লে এই যে বড় বড় বাড়িগুলো—

অরূপা। ওখানে যারা বাস করছে ওদের অনেকেই সত্যিকার ভারত-বাসী নয়। সত্যিকার মানুষ তারাই, যারা মেহনৎ করে খায়। যারা মেহনৎ করে খায়, তাদের ঘরবাড়ি নেই, যারা লুটেপুটে খায় তারাই দোমহলা পাঁচ-মহলা বাড়ি ফেঁদে বসেছে!

মণ্টু। শুনছ দিদি। লুটেপুটে খেলেই এরকম বাড়ি হয়। উঃ, তা হ'লে তো ভুল করছি আমরা!

অরূপা। তুমি সব বুঝবে না ভাই। তোমার দিদি হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন।

মণ্টু। ছাই বুঝেছেন। লুটেপুটে খাওয়া! এ্যাঁ—! দিদিরা তো বাধাই দেয় লুটেপুটে খেতে—নইলে মাঝে মাঝে মনে হয়—

অমলা। চুপ কর্ মণ্টু। আমিও তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারি নি ভাই। দো-মহলা পাঁচ-মহলা বাড়ী না থাকলেই কি লোকে উদ্বাস্তু হয়? কিন্তু এ নিয়ে কথা বলবার সময় আমার নেই— কাজগুলো নিয়ে কয়েক জায়গায় যেতে হবে।

অরূপা। যাবে বইকি। কিন্তু কমরেড, বলতে পার, এ করে কি হবে?

অমলা। আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকব।

অরূপা। তাও পারবে না। উদ্বাস্তু জনতাকে আজ সংগ্রামী হয়ে উঠতে হবে।

মণ্টু। আপনার কথাই ঠিক, লুটেপুটে খেতে না শিখলে ঘরবাড়ি গড়ে তোলা যাবে না। আমি ঠিক বুঝেছি।

অরূপা। না ভাই। ওই মেহনতী জনতা একদিন এই ঘরবাড়ি-ওয়ালাদের টুঁটি চেপে ধরবে—সেদিন আসছে। তাই বলছি কি ভাই, সংগ্রাম ছাড়া জীবন নেই। আপনি আসুন একদিন আমাদের সমিতির আপিসে।

মণ্টু। সমিতি! আমাদের বস্তিতেই তো একটি সমিতি আছে, কি নাম দিদি—শ্মশানবান্ধব সমিতি। তা আপনাদের সমিতি?

অমলা। বাচালতা বন্ধ কর মণ্টু। শোন বোন, আমার বাবা আছেন, দাদা আছেন—তাঁরাই সব ভাববেন।

অরূপা। এ যুগের মেয়ে হয়ে তুমি একথা বলছ? হাসালে—বাবা আর দাদা! সেই বাবা দাদা পাঠিয়েছেন তোমাকে কলকাতা সহরের বাড়ী বাড়ী ঘুরে—

অমলা। আমার বাবা দাদা সম্পর্কে এ ভাবে কথা বলবেন না।

মণ্টু। বলতে দাও না দিদি। বলে উনি আমাদের মুক্তি দিন, আমরা কাজে যাই।

অরূপা। বেশ কথা বল তুমি ভাই। এমন চটপটে—তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। তা তোমাদের যদি তাড়াহুড়া থাকে তা হ'লে আজ যাও। ঠিকানাটা বলবে কি?

মণ্টু। ঠিকানা বলতে আপত্তির কি আছে? চাঁপাতলা লেন, তেত্রিশ নম্বর। কিন্তু নম্বর বললে খুঁজে পাবেন না, আবার লেনটি লেন নয়—গোলকধাঁধা। সেখানে প্রবেশ করতে যদি পারেন, তা হ'লে বলবেন, মাস্টার মশায়ের বাড়ি কোন্ দিকে?

অরূপা। মাস্টার মশায়? নামটা কি ভাই। কোথায় মাস্টারী করতেন তিনি?

মণ্টু। গাঁয়ের হাইস্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন, নাম শ্রীযুক্ত হরিহর

ঘোষাল—নিবাস খুলনা, আদি নাম দুর্গাপুর—বর্তমান নাম রহিমাবাদ। পিতার পাঁচটি সন্তান, জ্যেষ্ঠ হরিশ বি. এ. ফেল খবরের কাগজের হকার, মেজ হারাণ আই. এ. পাস প্ল্যাষ্টিকের কারখানায় মুজরী করেন, সেজ শ্রীমান মণ্টু ওরফে মনতোষ বাবার স্কুলে ম্যাট্রিক পড়ে, অবসর সময়ে ঠোঙা তৈরীর ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার। কনিষ্ঠ নন্তু—বিদ্যাদাগর মশায়ের পাঠ নিয়ে ব্যস্ত, আর একমাত্র কন্যা মায়ের সহায়কারিণী এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ক্লথকাটিং এণ্ড ড্রেসস্যুইং কার্যে দক্ষা শ্রীমতী অমলা—

অমলা। মণ্টু! কি হচ্ছে এসব? চল্ দেখি—

অরূপা। চমৎকার! চমৎকার! সত্যি তুখোড় ছেলে।

['মর্মবেদনা' কাগজের রিপোর্টার বলরাম ধরের খোলা খাতায় লিখিতে লিখিতে প্রবেশ। তাহার কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝোলানো।]

বলরাম। একটুখানি দাঁড়ান—কি বলছিলেন,—একটুখানি বাকি, শুধু মাত্র একটা প্রশ্ন আর একটা পোজ—

মণ্টু। বাবা, ইনি আবার কে?

অমলা। মণ্টু আয়, কত সময় নষ্ট হ'ল বল্ দেখি?

মণ্টু। শুনিই না দিদি! ইনি গোত্রপ্রবর জানতে চান কি না—

অরূপা। অতটুকুর প্রয়োজন হবে না। তবে—ওঃ, আপনি বুঝি রিপোর্টার?

বলরাম। হ্যাঁ, আমাদের "যারা ঘর ছেড়ে আজ গাছের তলায়, পাত-শূন্য, পাথর কুড়ায়" ফিচারের জন্যে কাহিনী আর ছবি খুঁজে বেড়াই—দাঁড়ান দাঁড়ান, ছবিটা তুলে নিই। 'মর্মবেদনা'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়।

অমল। নাঃ, পথে আমাদের আর্টকে কি আরম্ভ করেছেন আপনারা: বাচালতা এবং খেয়ালেরও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন।

অরূপা। টুকে নিন, কি ধারাল বিপ্লবী উক্তি? এই তো বিদ্রোহিনীর চেহারা—

অমলা। আয় বলছি মণ্টু।

[অমলা মণ্টুর হাত ধরিল। বলরাম ক্যামেরা ঠিক করিয়া ধরিল। অরূপা অমলার কাছে ঘেঁসিল যেন দুঃখ ও করুণায় বিগলিত ভাব। মণ্টু গোবেচারীর মতো অঙ্গভঙ্গী করিয়া রহিল।]

মণ্টু। ঘাবড়াও কেন দিদি! কলকাতার লীলা, দেখি না কতদূর যায় ওরা!

[বলরামের ফটো তোলা শেষ হইয়া গেল। সে ক্যামেরা গুটাইল।]

বলরাম। যে প্রশ্নটা বাকি ছিল—

অরূপা। আমি জানি। দেখা হবে শিগ্‌গিরই। আসুন, কথা আছে।

[দুইজনে চলিয়া গেল।]

অমলা। কি কান্ড বল্ দেখি? তোর জন্যেই যত সব—

মণ্টু। তোমার জন্য দিদি। এবার চল।

[দুইজনে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় একটা বিড়ি টানিতে টানিতে অনল কাঞ্জিলালের প্রবেশ।]

অনল। আমি আপনাদের আট্‌কাব না, তবে সাবধান করে দেব শুধু। মেয়েটি সাংঘাতিক একটি দলের লোক—ফাঁদে পা দেবেন না। তার চেয়ে "সর্বদলীয় নিখিল পশ্চিমবঙ্গীয় উদ্বাস্তু জনগণ কল্যাণ-সাধক পরমার্থ-সমিতির" নিকট যাবেন, দশ নম্বর বেলতলা—

[অমলা দ্রুত চলিয়া গেল, মণ্টুও যাইতেছিল, ফিরিয়া চাহিল।]

মণ্টু। আজ্ঞে, বেলতলায় আমরা যাব না, নমস্কার।

[গান্ধীটুপী মাথায় সর্বেশ্বরের প্রবেশ।]

সর্বেশ্বর। এ কি ব্যাপার অনলবাবু? এঁদের পেছনে কেন?

অনল। আপনি কেন? কংগ্রেসের দালালি আর কত করবেন? লাভ নেই—লাভ নেই।

সর্বেশ্বর। নিজের দালালি করছি ভাই, তোমরা গদীতে বস, সাদা টুপী লাল নীল যাই বল ক'রে নেব।

[সর্বেশ্বর হাসিয়া উঠিল। দুইজনে প্রস্থান করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[নিরঞ্জন রায়ের বাড়ী—চঞ্চলার কক্ষ। চঞ্চলা একখানা প্লেট হইতে সন্দেশ খাইতেছিলেন এবং রেডিওয় যে গান হইতেছিল, তাহা শুনিতেছিলেন। গান শেষে রেডিও বন্ধ করিয়া দিয়া চঞ্চলা আয়নায় চেহারা দেখিতেছিলেন। ঝি প্রবেশ করিল।]

ঝি। মা ঠাকরুণ!

চঞ্চলা। কে? আচ্ছা ঝি, আমি কি কাহিল হয়ে গেছি রে?

ঝি। না না, কাহিল হবেন কেন?

চঞ্চলা। কি বললি? কাহিল হব কেন?

ঝি। এ রকম খাওয়া-দাওয়া করলে—

চঞ্চলা। হতভাগী, তুইও বলতে আরম্ভ করলি? অর্ধেক হয়ে গেছে খাওয়া, অজিতের জন্যে আরো কমেছে। এই তো আয়নায় দেখছি, আধখানা না হ'লেও—

ঝি। যা' বলেছেন! ভয়ে ভয়ে ও-কথাটা বলি নি, নইলে সত্যিই তো—কি যে হয়ে গেছেন—মা ঠাকরুণ!

[অজিতের প্রবেশ।]

অজিত। মা!

চঞ্চলা। তুই এলি অজিত? তোরা কি হ'লি বল্ দেখি? আমাকে বাঁচতে দিবি না? ওঁর হেনস্তা তো সারাজীবন সয়ে আসছি, তুই ছেলে হয়েও মার দিকে চাইবি না? দেখ্ দেখি, দুর্ভাবনায় আর না খেয়ে খেয়ে—

অজিত। দুর্ভাবনা যদি তোমার থাকত মা! তোমার কাছে আজ কেন এসেছি জান? দু-একটা প্রশ্ন করতে।

চঞ্চলা। আগে আমার কথার উত্তর দে। এখন থাকিস কোথায়?

অজিত। এই কলকাতায়ই। সময় বেশি নেই মা, বাবা ফেরবার আগেই বেরিয়ে যেতে চাই। তাঁর সামনে পড়তে চাই না এ জন্যে যে, হাজার হোক তিনি আমার জন্মদাতা, তাঁর মুখের ওপর কতকগুলি অপ্রিয় সত্য—

চঞ্চলা। থাম্। তুই যা তো ঝি, অজিতের জন্যে খাবার নিয়ে আয় আর এই সঙ্গে আমার জন্যেও—না হয় শুধু এক কাপ চা-ই—

ঝি। তা কেন মা-ঠাকরুণ। আমি আনছি।

[ঝি চলিয়া গেল।]

অজিত। এখন কিছু খাব না মা। আমি যা জানতে চাই—

চঞ্চলা। খাবি না কেন?

অজিত। অমনি, ক্ষিধে নেই।

চঞ্চলা। কি তুই জানতে চাস?

অজিত। জানতে চাই, তুমি কি জানতে, বাবা তাঁর বাল্যবন্ধু সত্য সুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জাল চেক দিয়ে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা একটা ব্যাঙ্ক থেকে—

[উত্তেজিতভাবে নিরঞ্জন রায় প্রবেশ করিলেন।]

নিরঞ্জন। নিকাল দাও, নিকাল দাও। একটা জোচ্চোর, বদমায়েস, জেলফেরত দাগী—ঘাড় ধরে, ঘাড় ধরে বিদেয় করে দাও। এ কি—অজিত?

চঞ্চলা। তুমি এমন করে কাঁপছ কেন গো?

নিরঞ্জন। কাঁপছি? কাঁপছি একটা জেলফেরত বদমায়েস আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসে, আর তাকে প্রশ্রয় দেয় এই যে, এই যে—তোমার-আমারই একমাত্র বংশধর এই অজিতকুমার!

অজিত। কথা কাটাকাটির ভয়ে তোমার সামনে আমি আসতে চাই নি বাবা। কিন্তু ওই লোকটা কি সত্যই ব্লেকমেলিং করছে? এ কথা কি মিথ্যা, দুজনের অপরাধে সে একাই জেল খেটেছে? সে কি তার স্ত্রীপুত্রের ভার তোমাকেই দিয়ে যায় নি? তারা আজ কোথায়, কি করছে, কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে—তার জন্যে তোমার দায়িত্ব কিছু নেই? অথচ সেই পাপের সবগুলো টাকা—

নিরঞ্জন। অজিত! (আর্তনাদের মত শুনাইল)

চঞ্চলা। এ সব কি বলছিস অজিত?

অজিত। । বাবাই বলুন যে মিথ্যা বলছি? বাবাই—

[হুড়মুড় করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল সতদুন্দর]

সত্যসুন্দর। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও ব্রাদার-ইন-ল, তোমার মনিবই সাহস পেল না ঠেকাতে—পালিয়ে এল। আর বাকি রইলে তুমি? অজিত!

তুমি কেন, তুমি কেন, বাবার সঙ্গে শত্রুতা করবে? যা করবার আমিই করব। তোমাদের ঘর ভাঙতে আমি চাই না।

নিরঞ্জন। ঘর আমার ভেঙেছ।

সত্যসুন্দর। তুমি যে আমার ঘরবাড়ি, পরিবার বংশ সবকিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছ! কেন দিলে, কেন দিলে নিরঞ্জন? এই যে, এই যে—

[সত্যসুন্দর বাহির হইতে টানিয়া লইয়া আসিল তাহার স্ত্রী মানদা ও ছেলে সুধীরঞ্জনকে। স্ত্রীলোকটির অদ্ভুত অবিন্যস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ, উন্মাদ চঞ্চল দৃষ্টি। ছেলেটি মলিন পোযাক পরিহিত, দীর্ঘ মাথার চুল, দেখিয়াই মনে হয় অভদ্র, অপরিচ্ছন্ন।]

চঞ্চলা। এরা কারা—এরা কারা?

সত্যসুন্দর। চেন না বউদি? চিনিয়ে দাও নিরঞ্জন এরা কারা?

মানদা। ও মা! এ যে দেখছি ঠাকুরপো!

[সে ঘোমটা টানিয়া মুখ ফিরাইল। সুধী ঘরের দামী দামী জিনিষপত্র, আয়না, রেডিও ইত্যাদি দেখিতে লাগিল, তারপর এক কোণে গিয়া একটি বিড়ি ধরাইল।]

সত্যসুন্দর। চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ নিরঞ্জন, আমার তুমি কি করেছ? আমি ব্ল্যাকমেল করছি তোমাকে? তিন বছর পর থেকে জেলে ওদের আর কোন সংবাদই পাই নি—তুমি কি ভেবেছিলে, জেলের হাঙ্গামার মামলায় ফাঁসিকাঠে ঝুলব অথবা—

নিরঞ্জন। আমি জানতে চাই এখান থেকে বিদায় হবে কি না?

সত্যসুন্দর। ধীরে বন্ধু, ধীরে। বিদায় আমি হব, কিন্তু কৈফিয়ৎ নিয়ে তবে এখান থেকে পা বাড়াব। তোমার স্ত্রী পুত্রের সম্মুখে আজ মুক্তকণ্ঠে সব স্বীকার কর, স্বীকার কর দু'জনে একই সঙ্গে অধঃপাতে যাবার পথ তৈরি করেছিলাম, তারপর—

নিরঞ্জন। চুপ কর। আমি তোমাদের খুন করব, গুলি করে মারব—সমাজের আবর্জনা—

সত্যসুন্দর। তুমি যে সমাজ-দেহের পূতিগন্ধ। আবর্জনা ঝাঁট্ দিয়ে দূর করা যায়। গুলি করবে, সে সাহস তোমার কই? একটা চোর, একটা

ডাকাত আমারও যে সাহস আছে তোমার তা নেই, থাকতে পারে না। তুমি যে জোচ্চোর, জোচ্চুরির ওপর গড়ে তুলেছ তোমার জীবন। বাতাসের শব্দে তোমার প্রাণ কেঁপে ওঠে, কাপুরুষ!

নিরঞ্জন। পারি না?

[নিরঞ্জন ড্রয়ার হইতে একটি রিভলভার টানিয়া হাতে লইল।]

নিরঞ্জন। পারি না, না?

সত্যসুন্দর। না, পার না।

[সুধী ভীত সন্ত্রস্তভাবে চাহিতেছিল। তারপর সহসা সকলের অলক্ষিতে একটা ফাউণ্টেনপেন ও স্নো পকেটে পুরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। মানদা মুখভঙ্গী করিয়া চঞ্চলার আঁচল ধরিয়া পাশে দাঁড়াইল। চঞ্চলা আতঙ্কে বিব্রত হইয়া উঠিল।]

চঞ্চলা। ওরে অজিত, আমার যে হার্টফেল করবে, অমনি দুর্বল দেহ—

নিরঞ্জন। তুমি ঘর থেকে যাও—

[নিরঞ্জন রিভলভার হাতে আগাইতে লাগিল। অজিত নিরঞ্জন ও সত্যসুন্দরের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল।]

নিরঞ্জন। অজিত! সরে দাঁড়া।

অজিত। না। আমাকেই গুলি কর বাবা। পুত্রহত্যায় তোমার হাত কাঁপবে কেন? স্ত্রী, পুত্র, সংসার, মান সম্ভ্রম, সত্য ন্যায় সব কিছুর চেয়ে বড় তোমার টাকা আর প্রতিপত্তি। তুমি এই টাকার জন্যে বন্ধুর সর্বনাশই কর নি ,ব্যাঙ্কের কর্তা হয়ে সেই ব্যাঙ্ক ফেল করিয়ে হাজার হাজার মানুষকে পথের ভিখিরী সাজিয়েছ। কিন্তু নিজের বাড়ি গাড়ি আড়ম্বর কিছুরই অভাব ঘটে নি। দেশের অগণিত মানুষের দুর্দশায় যাঁর বুক কাঁপে নি, সামান্য পুত্রের হত্যায় তিনি কুণ্ঠিত হবেন কেন?

নিরঞ্জন। কি বলছিস, কি বলছিস অজিত—আমার ছেলে—

[নিরঞ্জনের সর্বদেহ কাঁপিতে লাগিল। রিভলভার ফেলিয়া দিয়া তিনি একখানি আসনে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। সত্যসুন্দর হাসিয়া উঠিল।]

অজিত। কাকাবাবু! আপনাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম,

তবু এসেছেন। অবশ্য আমরা পাপ করেছি. তাই পাপকেও বাধা দিতে পারি না। কিন্তু কাকাবাবু, কথা দিচ্ছি, আপনার স্ত্রী-পুত্রের ভার আমিই আজ থেকে নিচ্ছি। আবার তাদের সুস্থ সবল মানুষ ক'রে তুলব—বাবার পাপ আমি স্বীকার করছি, জীবনভোর তারই প্রায়শ্চিত্তও করব। চলুন।

সত্যসুন্দর। অজিত!

অজিত। আর কথা নয়। আপনার পাপের প্রায়চিত্ত হয়েছে। বাবারটা এই শুরু। তবে আর কেন? আসুন।

নিরঞ্জন। যাস্ নে অজিত। তোরই জন্যে আমার সব। যা কিছু করেছি পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে।

অজিত। আমার কিছুই চাই না।

নিরঞ্জন। তা হ'লে—তা হ'লে আমি তোকে ত্যজ্যপুত্র করব।

অজিত। যদি আমার পিতৃপরিচয়টাও মুছে দিতে পারতে, তা হ'লে হয়তো স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারতাম। চলুন।

[অজিত চলিয়া যাইতেছিল।]

চঞ্চলা। অজিত! ওরে,

নিরঞ্জন। ডেকো না, যাক। ও আমার ছেলে নয়, কেউ নয়। যা—যা—যা—আমার নাম বংশ সব কিছু তোর সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হোক। পাপ—পাপ—

[অজিত যাইতে যাইতে সহসা আবেগভরে ফিরিল। তারপর আসিয়া বাবার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।]

অজিত। না, না, বাবা আমি ভুল বলেছি। এ দেহটা তোমারই দেওয়া। তা' অস্বীকার করার উপায় আমার নেই। সত্য মুছে ফেলতে পারি না। তাই আশীর্বাদ করো বাবা। তুমি যাই করে থাক, তোমার এইটুকু সৃষ্টি যেন সার্থক হতে পারে। মা! তুমি সোজা প্রকৃতির মানুষ—দুনিয়ার কিছু বোঝ না, দুঃখ পেয়ো না। তোমার ছেলে কর্তব্য করতে চলল।

[অজিত সত্যসুন্দর ও মানদাকে হাত ধরিয়া লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। নিরঞ্জন ও চঞ্চলা ওই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্যসুন্দর বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল।]

সত্যসুন্দর। তুমি আর যাই হও আমার চেয়ে অনেক বড়ো নিরঞ্জন, অজিতের মতো ছেলের জন্ম দিয়েছ। অজিতের বাবাকে আমি নমস্কার করছি।

[সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

['মর্মবেদনা'-সম্পাদকের নিজস্ব কক্ষ। সম্পাদক সত্যানন্দ বসিয়া লিখিতেছিলেন। প্রবেশ করিল অরূপা। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন সত্যানন্দ।]

সত্যানন্দ। কেমন আছ?

অরূপা। ছিলাম মন্দ কি, আছিও একরকম। কিন্তু থাক্‌ব যে কি রকম বুঝতে পারছি না।

সত্যানন্দ। সংশয়ের কারণ?

অরূপা। আপনারা ভাল থাকতে দিলেন কই? বেরিয়াকে নিয়ে যে তাল সামলান দায় হয়েছে। এতোকাল যে ছিল হিরো, সে কি না আজ বিশ্বাসঘাতক?

সত্যানন্দ। এমনি হয়। তার বিশ্বাসঘাতক হবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাই হয়েছে। কষে গালাগাল দাও, সংশয় দূর হয়ে যাবে। আমার কাগজের শিরোনামা দেখনি? তাই সত্য। বিদেশী চক্রান্ত বলে প্রকাশ কর, বাস—লোকে মেনে নেবে।

অরূপা। সত্যিই কি তাই?

সত্যানন্দ। মিথ্যা কোথায়? আমরা যা' বলি তাই তো সত্য। এ অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারলে সবই বৃথা হবে। নাঃ, তোমাকে দেখছি

আরো ট্রেনিং নিতে হবে।

অরূপা। হয়তো তাই।

সত্যানন্দ। জানো অরূপা, সংশয়বাদীর স্থান দলে নেই।

অরূপা। জানি বলেই তো উপদেশ চাই।

সত্যানন্দ। উপদেশ দেবার লোক তো আছেন?

অরূপা। মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম।

সত্যানন্দ। হাসালে। উনি সখের জন্য দলে ভিড়েছেন। ওঁদের অনেক আছে তাই বদ্‌হজমে ধরেছে আর ভাবছেন দেখা যাক্‌ এ পথে এলে হজ্‌মিশক্তি বাড়ে কিনা। কিন্তু আসল হচ্ছে তারাই যাদের হজমের শক্তি আছে কিন্তু উপাদান নেই।

অরূপা। তবে যে ওঁদের রাখা হয়েছে?

সত্যানন্দ। প্রয়োজন আছে বলে? তুমি যথাস্থানে যেয়ো সব বুঝ্‌বে। এবার বল, নতুন কিছু সংগ্রহ হল?

অরূপা। সামান্যই। একটি মেয়েকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। নিত্য দু'বেলা লক্ষ্মীপুজো করে—কি ভক্তি!

সত্যানন্দ। এই সেরেছে। পারবে না। অলক্ষ্মী কোথায় আছে খবর নাও।

অরূপা। অনেকই আছে, কিন্তু বড়ো ভীরু।

সত্যানন্দ। ভীরুতা মানেই উর্বরতা—ঠিক ক্ষুধার মতো। সব রকমের ক্ষুধায় যারা হাহাকার করছে আর কেড়ে খাবারও সাহস নেই, সেই তো বীজ বুনবার ফসল ফলাবার ক্ষেত্র। কানের কাছে অবিরাম মন্ত্র জপ কর অর্থাৎ চাষ করতে আরম্ভ কর, ঠিক প্রস্তুত হয়ে যাবে। চাই কি এদের সম্মুখে রেখে একদিন যুদ্ধযাত্রাও করা চল্‌বে।

অরূপা। হয়তো সত্যিই বলেছেন।

সত্যানন্দ। হয়তো কেন? এ আমাদের বৈজ্ঞানিক সত্য। ওই লক্ষ্মীদের এখন ঘাঁটিও না। ওদের ওই দেবতা সৃষ্টি যারা করেছিল, তাদের রাজনীতিজ্ঞান আমাদের দেবতার চেয়ে অনেক বেশী ছিল অরূপা। কতো যুগের ওই বাঁধনটা বল দেখি? আমরাও তাই আমাদের দেবতার

ছবি ঘরে ঘরে টাঙিয়ে রাখা সুরু করেছি। আগের মূর্তি ছেড়ে যেদিন ওরা নূতন মূর্তিকে পূজা করতে শিখ্‌বে, সেদিনই ওদের জয় করা সম্ভব হবে।

[বেয়ারার প্রবেশ।]

বেয়ারা। এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। নাম—

সত্যানন্দ। চেহারা কি রকম বল, নামে প্রয়োজন নেই।

বেয়ারা। পরণে খদ্দর।

সত্যানন্দ। বুঝ্‌লোম। তুমি যাও অরূপা। ইনি চলে গেলে ওকে আস্‌তে দেবে।

[অরূপা ও বেয়ারা চলিয়া গেল। সত্যানন্দ অভিনিবেশ সহকারে লেখায় মন দিলেন। হরিশ প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।]

সত্যানন্দ। আসুন।

হরিশ। এসেছি।

সত্যানন্দ। বসুন।

হরিশ। দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল।

সত্যানন্দ। তাই থাকুন।

হরিশ। আমার একটা বিষয়ে জানবার ছিল।

সত্যানন্দ। নিশ্চয়ই জানতে পারেন।

হরিশ। কিন্তু, আপনি একবার মুখ তুলে চান আমার দিকে।

সত্যানন্দ। কান তো আমি পেতেই রেখেছি। কান পেতে শুনছি, মুখ দিয়ে কথা বলছি, হাত দিয়ে লিখছি।

হরিশ। মনটা কোন্‌টায় আছে? শোনায়, বলায়, না, লেখায়?

[এইবার সত্যানন্দ মুখ তুলিলেন।]

সত্যানন্দ। অর্থাৎ? কি আপনি বলতে চান?

হরিশ। বলতে চাই লেখাটাই যদি আপনার জরুরী হয়, তা হলে আমি অপেক্ষা করতে পারি।

সত্যানন্দ। হুঁ। প্রয়োজন নেই অপেক্ষা করে। বলুন।

হরিশ। (সেদিনকার 'মর্মবেদনা' খুলিয়া) এই যে একটি ছেলে

আর মেয়ের ছবি ছাপিয়ে মাস্টার মশায়ের কাহিনী প্রকাশ করেছেন—

সত্যানন্দ। হ্যাঁ, করেছি, এবং সপ্তাহে তিন দিন এমনি করে থাকি।

হরিশ। কিন্তু মাস্টার মশায়ের অনুমতি নিয়েছিলেন কি?

সত্যানন্দ। অনুমতি! আপনি নিশ্চয়ই মাস্টার মশায় নন?

হরিশ। তাঁর বড়ো ছেলে।

সত্যানন্দ। বসুন।

হরিশ। বসার যোগ্য নই, সংবাদপত্রের হকারি করি আমি। প্রতিদিন ভোরে সংবাদপত্র অপিসের দোরগোড়ায় লাইন বেঁধে দাঁড়াই।

সত্যানন্দ। আমার এখানে বসতে পারেন, বাধা নেই।

হরিশ। আমার সময় অল্প।

সত্যানন্দ। আমারও।

হরিশ। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা সত্যের সন্ধান পাননি, পেয়েছেন একটা কঙ্কাল, তার ওপর এমনভাবে ভাষার রক্তমাংস চড়িয়েছেন দেখে অবাক্ হতে হয়। তা ছাড়া এ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চাও করেছেন। আমাদের নিয়ে ব্যবসা করার আমি প্রতিবাদ করতে এসেছি।

সত্যানন্দ। এ সব কি বলছেন? আবার এমন ভাষায় বলছেন যেটা হকারি ভাষা নয়।

হরিশ। হকারদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে বুঝি?

সত্যানন্দ। কথাগুলো ঠিক আমাদেরই ভাষায় বলছেন কি না?

হরিশ। হয়তো তাই। সুযোগ পেলে লিখতেও হয়তো পারতাম।

সত্যানন্দ। তা হলে সংবাদপত্রে একটা চাকরী জুটিয়ে নিন।

হরিশ। পেলেও করতে পারব না। প্রথমত মালিকের হুকুমে একবার এদিক আবার ওদিক করা অথবা পাঠকের মুখরোচক করে তোলবার জন্যে যা নয় তাই লেখা—মিথ্যা উত্তেজনা সৃষ্টি করে বাহবা কুড়ানো আমার দ্বারা চলবে না।

সত্যানন্দ। চমৎকার! আপনি বক্তৃতাও করতে জানেন দেখছি।

হরিশ। জানতাম। সে কথা থাক্। আমি জানাতে এসেছি

আমাদের পরিবারকে নিয়ে একটা কাহিনী ফে'দে এই মায়াকান্না কাঁদবার আপনাদের কোন অধিকার নেই।

সত্যানন্দ। ওঃ, আপনি নিশ্চয়ই বুর্জোয়াপন্থী। সেই প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ সংস্করণ।

হরিশ। উপরতলায় বসে, টিন টিন সিগারেট ফুঁকে এ কথাটা বলা মানাচ্ছে ভালই। জানতে পারি কি আপনি কোন পন্থী?

সত্যানন্দ। দুর্গতিপন্থী নই। এ কথা জেনে যেতে পারেন আমরা মায়াকান্না কাঁদছি বলেই আপনারা হাজারে হাজারে পথে পড়ে মরছেন না।

হরিশ। এখানে বসেই এই দশ বছর আগে লক্ষ লক্ষ লোককে পথে পড়ে মরতে দেখেছেন আর প্রগতির নেশায় বুঁদ হয়ে বসে শুধু মায়াকান্না কে'দেছেন। আজকে আমাদের বাঁচাবার জন্যে আর্তনাদ করছেন, কিন্তু আমাদের মৃত্যুর আহ্বানে কোথায় কেউ তো ক্ষীণকণ্ঠেও প্রতিবাদ করেন নি? আপনারা সবাই উচ্চকণ্ঠে দেশ ভাগ করবার জন্যে চীৎকার করেছেন, কই, কেউ তো বলেন নি—ভারতের হিন্দু দেশভাগ ঠেকাতে গিয়ে লড়াই করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক? আজ আমাদের নিয়ে সভা, শোভাযাত্রা, কঙ্কালদের গলির মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা—

সত্যানন্দ। উত্তেজিত হয়ে কি যা-তা বলছেন?

হরিশ। হ্যাঁ, হয়তো উত্তেজিত হয়েই উঠেছি। ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি জানিয়ে যাচ্ছি, যদি পারেন আমাদের সত্যিকার প্রতিষ্ঠার পথ দেখান, গড়ার মন্ত্র দিন। উদ্বাস্তুদের নিজেদের হাতে-গড়া গ্রামে গ্রামে দিকে দিকে আজ যে প্রতিষ্ঠার অভিযান চলেছে তাব দৃষ্টান্ত তুলে ধরে হতাশ হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করুন, আমাদের ব্যবসার পণ্য করে তুলবেন না।

সত্যানন্দ। এবার বিদায় হোন; নইলে—

হরিশ। নইলি কি?

সত্যানন্দ। বিদায় করতে বাধ্য হব।

হরিশ। এবার সত্যিই আপনার প্রগতিরূপ ফুটে উঠছে।

সত্যানন্দ। কে আছিস!

[ঘন ঘন বেল বাজাইতে লাগিলেন। বেয়ারা ও সঙ্গে সঙ্গে বলরাম

প্রবেশ করিল।]

বলরাম। খদ্দর দেখছেন না! যেতে দিন।

হরিশ। যা ভেবেছেন, তা নই।

বলরাম। যাই হোন, এই একই কথা—দালালী করছেন। মার্কিণের না কংগ্রেসের?

হরিশ। মোক্ষম মন্ত্র, অপূর্ব আবিষ্কার! 'মর্মবেদনা'র উপযুক্ত বটে। আসি। সাবধান-বাণীটা স্মরণ রাখবেন। আমরা পণ্য নই—মানুষ।

[হরিশ প্রস্থান করিল।]

সত্যানন্দ। তোমরা যে কি কর বলরাম? বার্তা-সম্পাদককে ডেকে দাও। কেন যাকে-তাকে নিয়ে এসব লেখা? তার চেয়ে দুটি লোক সাজিয়ে ফোটো তুলে একটা গল্প তৈরি করলেই হয়? একজন লিখিয়ে ধরে এক সংগে গোটা পঞ্চাশেক গল্প লিখিয়ে নাও, ছবির কোন ভাবনা ভাবতে হবে না।—কি ঝকমারী বল দেখি! কোথায় কোরিয়া যুদ্ধ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখছি আর কোথায়—যুদ্ধনীতির গোড়ার কথাটা সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল যে!

বলরাম। কাহিনী কতকগুলো আমিই তৈরি করে রাখতে পারি।

সত্যানন্দ। তাই করগে। এবার যাও দয়া করে। বেয়ারা, চা আর—

[সত্যানন্দ সিগারেট ধরাইলেন।]

পঞ্চম দৃশ্য

[হরিহরদের বাড়ী। সিদ্ধেশ্বরী আর অমলা।]

সিদ্ধেশ্বরী। এসব কি শুনছি রে?

অমলা। উতলা হ'য়ো না মা। দেশ ঘর বাড়ি ত্যাগ করে আসার আঘাতের চেয়ে আর বড় আঘাত কি হতে পারে?

সিদ্ধেশ্বরী। তুই কি অমলা! একথা শুনেও স্থির হয়ে আছিস্?

অমলা। আমি কি জান না মা? তোমাদেরই মেয়ে।

সিদ্ধেশ্বর। আমার নয়, ওঁর মেয়ে। আমার মেয়ে হলে মাথা খুঁড়ে মরতে।

অমলা। কই, তুমিও তো খুঁড়ছ না। মাথা খুঁড়ে লাভ কিছু নেই। বাবা বলেন,

[আহত মস্তক ও দেহে হরিহর প্রবেশ করিলেন। একটি লোক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল।]

হরিহর। বলি, কিন্তু কেউ আর শুনতে রাজী নয় রে। যাও ভাই, বাড়ি এসে গেছি।

[লোকটি প্রস্থান করিল। সিদ্ধেশ্বরী ও অমলা আসিয়া হরিহরকে জড়াইয়া ধরিলেন। সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতেছিলেন।]

হরিহর। কেঁদো না, কেঁদো না বড় বউ। এ গুরুদক্ষিণা। যাদের শিক্ষা দিচ্ছি, তারাই দক্ষিণা দিয়েছে আমাকে—ওই অবোধ শিশুর দল।

অমলা। বাবা, ভেতরে চল।

হরিহর। এখানে একটু বসি মা। তবু একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে, এই একফালি খোলা জায়গা—এখানেই বসি।

[অমলা হরিহরকে বসাইয়া দিল।]

হরিহর। হরিশ এখনও আসে নি?

অমলা। না বাবা, কিন্তু মণ্টু কোথায়?

হরিহর। মণ্টু! কারা বোধ হয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল রে।

সিদ্ধেশ্বরী। (আর্তকণ্ঠে) মণ্টু হাসপাতালে!

হরিহর। হ্যাঁ, বড় বউ, হাসপাতালে। দুঃখ ক'রো না। জানি না সে কোথা থেকে এ প্রেরণা পেয়েছিল! ওরা সইতে পারছিল না, ক্ষুদ্র

রঙ চটা একখানা জাতীয় পতাকা উড়বে স্কুল-ঘরের পাশে। টেনে এনে ছিঁড়তে চাইল তারা, বলতে লাগল—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়! কিন্তু তোমার আমার কিশোর ছেলে মন্টু এগিয়ে গেল বাধা দিতে। কাঁদবে কেন, তুমি আনন্দ কর বড় বউ, তোমার ছেলে দেশের পতাকার সম্মান রক্ষা করতে শিখেছে। এমনই হাজার মন্টু যদি এ দেশে জন্মায় সাধ্যি কি কখনও কোন বিদেশী পতাকা আর এসে ভারতের মাটিতে মূল গেড়ে বসতে পারে? আঘাতে আঘাতে মন্টু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, আমি চেয়ে দেখলাম, তবু তার মুঠিতে রয়েছে জাতীয় পতকা। জান, তখন আমার মনে হচ্ছিল, মন্টু যদি ম'রেও যায়—

সিদ্ধেশ্বরী। ব'লো না, ব'লো না, ওগো আর ব'লো না! একথা তুমি মনেও আন্‌তে পারলে?

হরিহর। সত্যি বলছি বড় বউ, এ মরা যে মানুষের মতো মরা।

[অমলা বাবার রক্ত মুছাইয়া দিতেছিল। এমন সময় দ্রুতপদে প্রবেশ করিল হরিশ ও জীবনবাবু।]

হরিশ। বাবা! বাবা!

সিদ্ধেশ্বরী। দেখ্, দেখ্, হরিশ! শুধু কি এই? মন্টুও হাসপাতালে গেছে।

হরিহর। অধীর হ'য়ো না তোমরা হরিশ, গুরুদক্ষিণা পেয়েছি।

জীবন। ছাত্রেরা বুঝি দিলে? তা তাদের ক্ষেপাতে গেলেন কেন? এ যুগে বুঝে-শুঝে চলতে হয়!

হরিহর। কি বলছ তুমি জীবন!

জীবন। যা সত্যি, তাই বলছি।

হরিশ। কি হয়েছিল বাবা?

হরিহর। কোথায় পৃথিবীর কোন্ কোণে নাকি কাদের ওপর কারা গুলি ছুঁড়েছে, কাকে নাকি ফাঁসিতে ঝোলাবে—

হরিশ। হ্যাঁ, জানি।

হরিহর। অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াবে। আমি কালই বলেছিলাম ছেলেদের, কিন্তু এতে তোমাদের কোন

কর্তব্য নেই। তোমরা শিশু—কিশোর। যারা প্রাপ্তবয়স্ক, অধিকারী, রাজনীতি তারা করবে, প্রয়োজন হ'লে লড়াই করবে—দেশের মানুষের জন্যেই হোক কিংবা বাইরের মানুষের জন্যেই হোক। তোমরা করবে পড়াশোনা, ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হবে।—আমার কথা তারা বুঝেছিল। কিন্তু—

জীবন। কিন্তু আসল বোঝাবার যারা, তারা আপনি মাস্টার মশায় নন, আমরা বাবা-কাকাও নই।

হরিহর। আজ ছেলেরা শান্তশিষ্টের মত অনেকেই ক্লাশে এসেছিল। কিন্তু মনে হ'ল যেন দু-একজন মাস্টার এটা সইতে পারেন নি, আর বাইরের একদল ছেলেও। ওই ছেলেরা একটা লাল নিশান নিয়ে এসে চীৎকার করতে লাগল, আমার ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠল—অবশেষে বেরিয়ে যেতে লাগল তারা। আমি বেত হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম, কি দুঃসাহস ছেলেদের! কি অন্যায়! তারপর—

জীবন। সুরু হয়ে গেল তাণ্ডব।

হরিহর। সব তচনছ করে দিলে। বাইরে থেকে আমার ছেলেরা আমাকেই ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। ক্ষুদ্র একখানা জাতীয় পতাকা—

হরিশ। তুমি ভেতরে চল বাবা। না, এখানে বসে থাকলে চলবে না। জীবনকাকা! একজন ডাক্তার—

জীবন। তাই দেখি। কিন্তু আমাদের এ প্রতিবাদ কেন? চেয়ে চেয়ে দেখব, কান পেতে শুনব আর দরকার হলে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব। ব্যাস!

[জীবন বাহির হইয়া গেলেন। হরিশ ও অমলা হরিহরকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল—সিদ্ধেশ্বরীও সঙ্গে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই হরিশ ও অমলা বাহিরে আসিল।]

অমলা। তুমি হাসপাতালে যাও দাদা, মণ্টুর খবর নিয়ে এসো।

হরিশ। কিন্তু জীবনকাকা ডাক্তার নিয়ে এলে ওষুধ আনতে হবে—হারাণ তো সেই সন্ধ্যের আগে ফিরবে না।

অমলা। এ দিকটা আমিই দেখব দাদা। মা হঠাৎ চুপ্ হয়ে গেছেন। কখন যে কি করে বসবেন, ভাবতে পারছি না। তুমি যাও, মণ্টুকে নাকি

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

হরিশ। তাই যাচ্ছি অমু। জীবনকাকার সাইকেল নিয়ে এ কদিন ঘোরাফেরা করছি, সাইকেল চড়েই যাব আসব। বাবার জন্যে চিন্তা করি না, কিন্তু মাকে দেখিস। এই যে হারাণ! এত সকালে?

[হারাণের প্রবেশ। হাতে গুটানো একখানা বিদেশী পতাকা।]

হারাণ। অমু! খাবার আছে কিছু? খুব তাড়াতাড়ি। এখনই শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুতে হবে। ঘুরে ঘুরে তবে যাব ময়দানে—পথে শ্লোগান আওড়াতে হবে, হেঁটে যেতে হবে। কতখানি পথ একবার ভেবে দেখ্।

অমলা। তুমি থামো মেজদা। যাও দাদা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

হরিশ। কিন্তু আরো যে বিপদের আভাস পাচ্ছি রে।

অমলা। বিপদ ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে তবে কাটবে। তুমি যাও।

[হরিশ প্রস্থান করিল।]

অমলা। তোমার আজ কাজ নেই মেজদা?

হারাণ। ষ্ট্রাইক, ষ্ট্রাইক অমু। তুই তো জানিস না, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল তাদের মারণাস্ত্র নিয়ে নবচেতনায় জাগ্রত নিপীড়িত শোষিত জনগণের ওপর হিংস্র কামড় বসাতে উদ্যত, আজ বিশ্বের মেহনতী মানুষ বজ্রকণ্ঠের আওয়াজে তাদের শুনিয়ে দেবে—সাম্রাজ্যবাদী মুরদাবাদ, দস্যুদল মুরদাবাদ। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

অমলা। আস্তে কথা বল। মুখস্থ করে এসেছ বুঝি? কোন্ স্কুলে পাঠ নিচ্ছ আজকাল?

হারাণ। আস্তে কেন রে? চেঁচাতে হবে তবে তো লোকে শুনবে, বুঝবে। মুখস্থর কথা বলছিস? তা মুখস্থই করতে হয়। বই এনে দেব তোকে, সব সন্ধান পাবি তাতে। তোর এই যে জামা সেলাই—এরও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তিনি কি বলেন জানিস্, এরকম করে যারা আত্মরক্ষা করে তারা বিপ্লবকে পিছিয়ে দেয়, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অমলা। তিনিটি কে?

হারাণ। বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পরম পিতা।

অমলা। পরম পিতা! হাতে এটি কি?

হারাণ। এই দেখ্ (পতাকা খুলিয়া ধরিল) এ হচ্ছে বিশ্বের শোষিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার—

অমলা। বললাম না, আস্তে কথা বল। কবে থেকে তুমি রাজনীতি করতে আরম্ভ করেছ?

হারাণ। যবে থেকে বুঝেছি—

অমলা। এদিকে খবর রাখ, তোমাদেরই রাজনীতি কি ঘটিয়েছে! বাবা আহত হয়ে ফিরে এসেছেন, মণ্টু হাসপাতালে।

হারাণ। বাবার যা মতবাদ! কি আশ্চর্য! নিশ্চয়ই বেত নিয়ে স্কুলের ধর্মঘট ঠেকাতে গিয়েছিলেন। কি করি বল্ দেখি, ওদিকে আমার যে না গেলেই নয়! না, অমু, এবার যাই—পরে বাবাকে আমাদের বোঝানো দরকার, বই এনে তাঁকে পড়তে দিতে হবে।

অমলা। তুমি এমন হবে ভাবি নি মেজদা!

হারাণ। তুইও এমন হবি ভাবি নি। বাবা না হয় সেই বুর্জোয়া আমলের মরচে-ধরা নীতি নিয়ে অতীতের জাবর কাটছেন—

অমলা। মেজদা! চুপ কর। বাবার সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে—

হারাই। বাবার সম্বন্ধে কথা বলা? জীবনে বাবা কতটুকু— শুধু জন্মদাতাই, আর কিছু নয়। বাবা-মার ভাই-ভগ্নীর চয়েও বড়ো আজ আমাদের কাছে বিশ্বের মেহনতী জনতা—তারও চেয়ে বড়ো, সবার বড়ো—সেই জনতার যিনি পিতা—

[মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে সিদ্ধেশ্বরী।]

হরিহর। কে? কে? হারাণ! আমার কুলপ্রদীপ এসেছ? ওখানে কে যেন ব্যঙ্গভরে আমাকে শুনিয়ে বলছিল তোমার নাম, তুমি নাকি তাদের দলে অথচ তোমার বাবা হয়ে দুর্বৃত্ত হরিহর বাধা দিচ্ছে তাদের! তখন থেকেই ঘোষাল বংশের মুখোজ্জ্বলকারী তোমাকে দেখবার জন্যে আকুল হয়ে আছি।

অমলা। বাবা, তুমি ভেতরে যাও—দোহাই তোমার।

হরিহর। না, হারাণকে যোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে তো তোরা

পারবি না!

হারাণ। বাবা!

হরিহর। বাবা ডাকিস না, ডাক্—শত্রু! কি বলছিলি না একটু আগে? বল্ আবার যা মুখস্থ শিখে এসেছিস্, বল্। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

হারাণ। আমার কথা—

হরিহর। এ অবস্থায় কি বলতে হবে কোন বইয়ে তোদের তা লেখে নি বুঝি? কেউ শিখিয়ে দেয় নি? যা যা, শিখে আয়, তারপর এসে শুনিয়ে যাস। যা। নইলে, নইলে ওরা ঢিল মেরে মাথা ফাটিযে দিয়েছে, তুই লাঠি মেরে ভেঙে দে এ মাথাকে, সমস্ত অতীতকে, তারপর প্রেততাণ্ডবে সবাই মিলে নৃত্য কর্—আয়।

অমলা। তুমি কি মেজদা! যাও, যাও এখান থেকে।

[হারাণ কাঁপিতেছিল। তাহার হাত হইতে পতাকাখানি পড়িয়া গেল। সে পলাইল। অমলা পতাকাখানি তুলিয়া লইল।]

হরিহর। মুড়ে রাখ্ অমলা। একে অসম্মান করিস নে। কোন দেশের পতাকাকেই আমরা অসম্মান করি না। কিন্তু যদি তোরা পারিস, যাদের পতাকা তাদের দেশে পাঠিয়ে দিস্

[জীবন একজন ডাক্তার লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। তুমি ডাক্তার নিয়ে এসেছ জীবন? ডাক্তার! পার আমার ক্ষতটা আরো বড়ো করে দিতে, যা দিয়ে দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে বেরিয়ে যেতে পারে? এ যুগে এ রক্তের সার্থকতা বুঝি বয়ে যাওয়ায়ই, দেহে থাকায় নয়। তাই কর, তাই কর ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও।

বিরাম—যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হরিহরের বাড়ী]

সিদ্ধেশ্বরী। ভাব্‌ছি—এ ছাড়া আর কি করবার আছে?

হরিহর। এমন করে বসে আছ যে?

[সিদ্ধেশ্বরী বসিয়াছিলেন স্তব্ধভাবে। হরিহর প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। অনেক কিছুই করবার আছে বড় বউ। বাড়ী তৈরী হচ্ছে —হোক না তা ছোট, সাধারণ—তা' সাজিয়ে তুলতে হবে। সে তো তোমাদের, মেয়েদেরই কাজ।

সিদ্ধেশ্বরী। বাড়ী, ঘর সাজিয়ে তোলা? সবাই যাব সেখানে, কিন্তু একটা বছর কেটে গেল, আমার হারাণ?

হরিহর। তোমার হারাণ? হ্যাঁ, তোমারই—আমার নয়।

সিদ্ধেশ্বরী। তোমারও।

হরিহর। কিন্তু সে স্বীকার করে না। বড় বউ, আমার সৃষ্টি এমন করে ব্যর্থ হয়ে যাবে, কখনো কল্পনা করি নি।

সিদ্ধেশ্বর। মানুষের ছেলেমেয়ে কেউ কি বিপথে যায় না?

হরিহর। কিন্তু হারাণ এমন পথে গেছে—সে পথের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। অধঃপাতের পথ থেকে টেনে তোলা যায়, উৎপাতের মোহ না-ভাঙলে ধর্মকথায় সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার ওসব মাস্টারী কথা বুঝি না। শুধু বুঝি, আমি মা।

হরিহর। আমিও বাবা। জন্ম দিয়েছি আমিও—তুমি পালন করেছ। কি যে বেদনা আমার। সে ভিন্নমত পোষণ করে বলে নয়, সে বড়ো হয়েছে সে অধিকার তার আছে। বেদনা সে বাবা-মাকে নিজের মাতৃভূমিকে অস্বীকার করে বলে। দুঃখ করো না, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যদি আমাদের থাকে, তাহ'লে হারাণ তোমার ফিরে আস্‌বে।

[হরিশ প্রবেশ করিল।]

সিদ্ধেশ্বরী। এতো দেরী কেন রে?

হরিহর। বাড়ীর দিকে ঘুরে এলে?

হরিশ। না বাবা! রাস্তায় আট্‌কা পড়ে গেলাম—হুজ্জত পোয়াতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। মণ্টু সেখানে গেছে।

সিদ্ধেশ্বরী। আমি বলি কি হরিশ, কলকাতা তার আশ-পাশ ছেড়ে আমরা এমন কোথাও যাই—কোন গাঁয়ে। আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকি রে। তোদের হাঙ্গামা হুজ্জতের কথা শুনি আর বিনা ঘুমে ভেবে ভেবে রাত কাটাই। একটা তো পর হয়ে গেছে—

হরিশ। তুমি যে কি ভাব মা! আমাদের সেই মা এমন হয়ে গেলে? জেলে যাবার সময়ও তো তোমার হাসি মুখ দেখে গেছি।

সিদ্ধেশ্বরী। তখন আশা ছিল। আজ শুধু নিরাশা। আমি আর পারি না।

[সিদ্ধেশ্বরী চলিয়া গেলেন।

হরিহর। বাবা কর্তব্যে চিরকালই পাষাণ হতে পারে হরিশ, মা পারে না। তা হুজ্জতের কথা কি বলছিলে?

হরিশ। একটি মা আর ছেলে। জানি না মেয়েটি কেন কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু যে-কারণেই আসুক, সে আজ ফুটপাথে মরে পড়ে আছে আর ছেলেটি পাশে পড়ে কাঁদছে। ক্ষিধের জ্বালায় মরা মার মাই টানছে। লোক জমে গেছে চারদিকে, উ'হু আহাও করছে লোকে। কেউ বা সরকারকে অভিশাপ দিচ্ছে কিন্তু কেউই ওদের কোন ব্যবস্থা করছে না। সংবাদপত্রের রিপোর্টার এসে ফটো নিয়ে গেলেন।

হরিহর। তুমি কি করলে?

হরিশ। আশেপাশে বড়ো ছোট অনেক বাড়ীতেই ঘুরলাম, সবাই বেদনা বোধ করলেন, আর কিছু নয়। শেষকালে—

হরিহর। তুমিও বেদনা বোধ করে চলে আস্‌তে বাধ্য হলে।

হরিশ। না বাবা! আমরা গাঁয়ের লোক যে। তাই মাকে শ্মশানে পাঠিয়ে এলাম আর ছেলেটিকে নিয়েই এলাম—অমলার কাছে আছে।

[সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।]

সিদ্ধেশ্বরী। নিজের ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, তোমরা এখন

পরের ছেলে, পথের ছেলে কুড়িয়ে বেড়াও। আমি সইতে পারব না। আমার যদি কোন অধিকার থাকে এ বাড়ীতে—

হরিহর। বলো না, বলো না বড় বউ, বলতে নেই।

সিদ্ধেশ্বরী। না, বলতে নেই। তোমরা—

[ছেলেটিকে নিয়া অমলা প্রবেশ করিল। সঙ্গে নন্তু।]

নন্তু। কতো বল্‌ছি কাঁদে না, তবু ও কাঁদছে। এতো কাঁদে কেন মা?

[ছেলেটি 'মা' 'মা' বলিয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল আর চারদিকে মাকেই খুঁজিতে লাগিল।]

অমলা। মাকে খুঁজছে।

সিদ্ধেশ্বরী। মাকে খুঁজছে? কি বল্‌লি? মাকে খুঁজছে?

[ছেলেটি—মা, মা।]

অমলা। মা!

নন্তু। এই, কাঁদে না—এই তো মা!

সিদ্ধেশ্বরী। কার ছেলে রে হতভাগা! মাকে খুঁজছিস্‌?

হরিহর। মাকে খুঁজছে—তাড়িয়ে দিতে পারবে বড় বউ?

সিদ্ধেশ্বরী। এতো লোকে পারল আর আমি পারি না?

হরিহর। তাড়িয়েই দাও তা হ'লে। পথে গিয়ে মা মা ডেকে কাঁদুক।

সিদ্ধেশ্বরী। আমার ছেলেটাও কি একবারও মায়ের কথা মনে করছে না! না, ওরে তাড়াব না। আয়, আয়, আমাকেই ডাক মা! আয়—

[ছেলেটিকে কোলে লইয়া সিদ্ধেশ্বরী দ্রুত ভিতরে চলিয়া গেলেন। অমলা ও নন্তুও পেছনে গেল।]

হরিহর। জানতাম বড় বউ! তুমি তাড়িয়ে দিতে পার না। হরিশ, যাও। আবার তো বেরোতে হবে। আমিও—

[বাইরে নিরঞ্জন রায়—"হরিহরবাবু এ বাড়ীতে থাকেন?" হরিশ বাইরে গেল এবং নিরঞ্জন ও চঞ্চলাকে লইয়া আসিল।]

হরিহর। এ কি করে সম্ভব। আমি যে ভাবতেই পারছি না।

নিরঞ্জন। জানি না ভাবতে পারা যায় কিনা। কিন্তু আমার সব গেছে মাষ্টার মশাই, আমি আজ ভিখিরী হয়ে এখানে এসেছি।

হরিহর। আগে বসবার জায়গা দে হরিশ! আর তোর মাকে ডেকে দে।

চঞ্চলা। ডেকে দিতে হবে না, আমিই ভেতরে যাচ্ছি।

[চঞ্চলা ভিতরে গেলেন। হরিশ একখানা মাদুর বিছাইয়া দিল। নিরঞ্জনবাবু বসিলেন।]

হরিহর। আমার এখানে এসেছেন ভিক্ষা চাইতে নিরঞ্জনবাবু? এটা ত খুবই ভাল করে জানেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আমি সইতে পারি না।

নিরঞ্জন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নয়। আমি এসেছি ছেলেকে ভিক্ষা চাইতে।

হরিহর। ছেলেকে? কার ছেলে?

নিরঞ্জন। আমার ছেলে—অজিত।

হরিহর। আমি কি ছেলেধরা? আশ্চর্য! এ বাড়ীর একজন চাইছেন তাঁর ছেলে—আপনিও চাইছেন। কিন্তু ওটা বুঝি, এটা যে বুঝছি না।

নিরঞ্জন। অজিত অমলাকে ভালবাসে। অমলাও অজিতকে—

হরিহর। ভালবাসে?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, মা-বাবার জন্যে সে বাড়ীতে ফিরে না। যেতে পারে। কিন্তু অমলা যদি বলে—

হরিহর। বাবা-মাকে চাইবে না, কিন্তু—

নিরঞ্জন। আমি কথা দিচ্ছি, অমলার সঙ্গেই তার বিয়ে দেব।

হরিহর। আমাকে কৃতার্থ করবেন। বড়বউ, বড়বউ—

[সিদ্ধেশ্বরী ও চঞ্চলা প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। শোন, শোন, অমলাকে বল, ওঁর ছেলে ফিরিয়ে এনে দিক। আর তুমি শাঁখ বাজাও, তোমার মেয়ে নিরঞ্জন রায়ের পুত্রবধূ হবে।

চঞ্চলা। তুমি কি বলেছ গো!

হরিহর। সত্যি কথাই বলেছেন।

চঞ্চলা। নিশ্চয়ই বলেন নি। নিজের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে আবোল-তাবোল বকেছেন। বন্ধুকে ঠকিয়েছেন, জেল খাটিয়েছেন, তার ছেলেকে-মেয়েকে—দুনিয়াশুদ্ধ লোককে ঠকিয়েছেন। সেই পাপে ছেলে বাড়ী ছেড়ে গেছে। আমিও অন্ধ হয়েছিলাম।

নিরঞ্জন। কিন্তু—

চঞ্চলা। থাম। আমাকে বলতে দাও। আমি আপনাদের কাছে কেন

এসেছি জানেন, এসেছি বলতে যে আপনারা আমাদের দেশের লোক। অজি তার মাস্টার মশায়কে ভক্তি করে, তাঁর কথা সে ঠেলতে পারবে না। তিনি যা ডেকে বলেন—

নিরঞ্জন। তাই করুন মাস্টার মশায়। ছেলে বলে, আজ স্ত্রীও বলছেন আমি অপরাধী, অধঃপতিত। কিন্তু আজকার দুনিয়ায় পুঁথির পাতায়ই এগুলি অপরাধ। নইলে আমার জাতের লোকরাই সমাজে শিরোমণি হয়ে আছেন। কেউ করছেন নেতৃত্ব, কেউ বিলাচ্ছেন উপদেশ আর কেউবা ধর্মকর্ম করে লোকের কাছে পুজো পাচ্ছেন। আমি অপরাধী সেজেছি কেন জানেন, স্নেহে দুর্বল বলে।

চঞ্চলা। দোহাই তোমার, থাম। কার সম্মুখে তুমি এসব বলছ?

হরিহর। মিথ্যা বলেন নি রায় মশায়। এ নিয়ে আমি তর্ক তুলতে চাই না। কিন্তু, এ যুগেও তা হলে অজিতের মতো ছেলে জন্মায়—

নিরঞ্জন। আর মাস্টার মশায়ের মতো প্রাচীনপন্থীও বেঁচে থাকেন।

হরিহর। আছি কি নেই, এখনও ঠিক বুঝছি না। মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি—চারপাশের সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে পারলাম না, তা'হলে এ থাকা কি বেঁচে থাকা?

নিরঞ্জন। আমার আবেদনের উত্তর চাই মাস্টার মশায়! কথা দিচ্ছি, অজিত ফিরে আসুক, সব তার হাতে তুলে দিয়ে আমি সুদূর কোন তীর্থ-স্থানে চলে যাব।

হরিহর। সন্ন্যাসী হবেন?

নিরঞ্জন। প্রয়োজন হলে তাই হব।

হরিহর। কাপুরুষ! ভয়ে পালিয়ে যাওয়া। প্রায়শ্চিত্তের হাত এড়াবার চেষ্টা করতে—অথবা ভগবানকে ঘুষ দিতে যাবেন?

নিরঞ্জন। ভগবান কোথায় যে তাঁকে ঘুষ দেব?

হরিহর। অজিতকে জিজ্ঞাসা করবেন ভগবান আছেন কি নেই। অজিতের থাকাটাই বলে দিচ্ছে তিনি আছেন। আর এই মুহূর্তে আপনার করুণ মূর্তি দেখে মুখ টিপে হাসছেন।

চঞ্চলা। এসব কথা থাক্—আমাদের—

হরিহর। আপনারা বাড়ী যান, রায় মশায় দেবতার কাছে কায়মনো-বক্যে প্রর্থনা করুন, চোখের জলে মনের ক্ষোভে প্রায়শ্চিত্ত করুন, অজিত নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।

[অমলার প্রবেশ।]

অমলা। এদের জন্যে চা-খাবার প্রস্তুত করেছি বাবা। এখানেই কি নিয়ে আস্‌ব?

নিরঞ্জন। তুমি অমলা? সেই শিশুটী দেখেছিলাম।

[অমলা তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

অমলা। বাবা!

হরিহর। ভেতরেই তো ভাল মা! আসুন আপনারা।

নিরঞ্জন। না, না,—

সিদ্ধেশ্বরী। সে কি করে হয়?

[সকলে ভিতরে গেলেন। হরিহর অমলাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।]

হরিহর। অমু!

অমলা। বাবা।

হরিহর। আমার কাছে সত্যি কথা বলবে?

অমলা। তাই বলতেই তো তুমি শিখিয়েছ বাবা।

হরিহর। একথা কি সত্যি, অজিত তোকে ভালবাসে? উত্তর দিতে তুই সংকুচিত হস্‌নে অমু। তোদের আমি শাসন করি আবার তোদের সঙ্গে খেলাও করি। তোরা আমার সন্তানও বন্ধুও। আমি যে তোদের মাঝেই বেঁচে থাক্‌ব রে?

অমলা। অজিত দা'—হ্যাঁ, অজিতদা হয়তো—

হরিহর। আর তুই?

অমলা। (নীরব রহিল)

হরিহর। চুপ করে রইলি? এতে অপরাধ কিছু নেই রে। যে বাবা বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বড় করে তুলে, তার এতে আপত্তি করবার কিছু থাকতে পারে না।

অমলা। এ সংসারে তুমি যা বলবে তাই হবে। আমার ভাল আমি আজ

যতটুকু বুঝি তার চেয়ে তুমি যে বেশী বোঝ, এ জ্ঞান আমার আছে। এ নিয়ে উতলা হয়ো না বাবা।

হরিহর। উতলা নই মা—আমাকে কর্তব্য স্থির করতে হবে।

অমলা। ওদের ভেতরে রেখে এসেছি, এখন যাই।

হরিহর। হ্যাঁ, যা—ওদের তুইই বলিস্—কে? কে? কে?

[সন্ত্রস্তভাবে হারাণ প্রবেশ করিল।]

হারাণ। এই বস্তির ওদিকে হাঙ্গামা বেঁধেছে—পুলিশ এসেছে তাই—সব থেমে গেলেই চলে যাব। থাক্‌তে আসিনি।

হরিহর। শুধু ভয়ে বাবা মার কাছে লুকিয়ে থাক্‌তে এসেছিস্?

হারাণ। ভয়ে নয়, বাবা মার কাছেও নয়। ধরা পড়তে চাই না বলে এসেছি। আদেশ যে তাই। যে কোন ভাবেই এড়িয়ে থাক্‌তে হবে।

হরিহর। বাবা মার কাছে নয়? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—

অমলা। বাবা!

হরিহর। না অমলা! বেরিয়ে যা—পুলিশ তোকে ধরুক, ফাঁসিতে লটকে দিক, আমাদের কি—যা—

হারাণ। যাচ্ছি—যাচ্ছি—আরো বাড়ী আছে, মানুষ আছে।

[হারাণ বাহির হইয়া গেল। উন্মাদিনীর মতো সিদ্ধেশ্বরী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন ও চঞ্চলা।

সিদ্ধেশ্বরী। কে? কে? কার কথা শুনছিলাম? উত্তর দিচ্ছ না যে তোমরা? তাহলে হারাণই এসেছিল আর তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ?

হরিহর। তাই দিয়েছি। দিয়েছি সে বাবা মার কাছে আসেনি বলে।

সিদ্ধেশ্বরী। তুমি সব পার—সব পার!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মেসে অজিতের ঘর। অজিত ও সত্যসুন্দরের ছেলে সুধী।]

সুধী। চটপট, চটপট কর অজিতদা! দেখি তোমার ঘড়িটা, এই দ্যাখো ছ'টা প্রায় বাজে,--আরে এমন করে তাকিয়ে আছ কি? হাতাব না ঘড়িটা। ও-বিদ্যাটা তো তুমি আর বাবা দু'জনে মিলে ভুলিয়ে দিয়েছ। কি আর করি, এখন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। নইলে, তোমার কাছে হাত পাতব কেন?

অজিত। তুমি টাকা নিয়ে এখন কি করবে?

সুধী। হাসালে অজিতদা! আচ্ছা, তুমি যে মাসে মাসে এই এত্তো-গুলো টাকা উপার্জন কর, সেগুলো দিয়ে কি কর বল দেখি? আমরা আর কত নিই—এই মাঝে মাঝে দু-চার টাকা করে পাঁচ-সাত দশ-বিশ-পঞ্চাশ—এই পর্যন্ত। বাবা তো নিতে পারলেও নেবেন না। ওদিকে নিজের বাবাকে ত্যাজ্য করে এসেছ। মেসের খরচ আর কি? অবিশ্যি, কলকাতায় দাদা, টাকা যেমন ছড়ানো আছে, তেমনি আবার ওড়াবার পথও হাজারটা। এই দেখ, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

অজিত। আমার কাছে টাকা নেই।

সুধী। নেই? তা হ'লে একখানি কাঁচি কিনে দাও. ব্যাস, বিদ্যে তো জানাই আছে—হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে একটা বাসে চাপলেই হয়ে যাবে। কাঁচিই দাও।

অজিত। কিছুই দিতে পারব না, তোমার যা খুশী কর গে।

সুধী। বলাটা খুব সহজ অজিতদা। কি সর্বনাশ তুমি আমার করেছ জান? বেশ সুখে ছিলাম, ধূমকেতুর মতো হঠাৎ এলেন বাবা, এসে বললেন, তিনি নাকি আমার জন্মদাতা। তারপর কোথা থেকে এসে জুটলে তুমি। আমার সব গেল, বিদ্যে গেল, বুদ্ধি গেল, উপার্জন গেল—

অজিত। তুমি এবার যাও।

সুধী। বলটা খুব সহজ। কিন্তু কাঁচি? গোপনে গোপনে অভ্যেসটা রেখেছিলাম তাই বাঁচোয়া। নেমে পড়লে যা' করেই হোক—

অজিত। জানতাম না যে, অধঃপাতে যারা যায় তাদের আর টেনে

তোলা যায় না।

সুধী। অধঃপাতে! আমি অধঃপাতে গেছি? পথেঘাটে আমি তো অধঃপাতের যাত্রীই বেশি দেখি। এই তো তোমার মেসের তের নম্বরের নরহরিবাবু—বড় চাকরী, দক্ষিণেশ্বরে যান প্রতি শনিবার, রোববারে যান কালী-বাড়ী, ভক্তিমান মানুষ—একদিন দেখলাম বৌবাজারে ফার্নিচারের দোকানে দর কষাকষি করছেন অফিসের বিল নিয়ে, তাঁর দশ পার্সেণ্ট হবে না পনর পার্সেণ্ট হবে? দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। তারপর সেদিন বেরিয়ে আসার পর সেণ্ট পার্সেণ্ট আমি তাঁর পকেট থেকে বুঝে নিয়েছিলাম। কত রকমের কত নরহরি কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আর এদেশে অধঃপাতে গেলাম শুধু আমি?

অজিত। তোমার সংগে আমি বকতে পারি না। এবার যাও, আর—

সুধী। এস না, এই তো? কিন্তু অজিতদা, কথা দিচ্ছি, পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিলে আর সত্যি আসব না।

অজিত। কিসের পাওনা গণ্ডা?

সুধী। জেনেও যখন জান না, তখন বলছি। আমার বাবা আর তোমার বাবা দুজনের বখরাদারীতে ব্যাংক মারার কারবার হয়েছিল, তারপর লাভের টাকাটা জমা রইল তোমার বাবার কাছে। বাবার উত্তরাধিকারী আমি তোমার কাছে সেই অংশটা দাবী করছি।

অজিত। ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে সুধী। ইচ্ছা করেই তোমার অনেক অত্যাচার সয়েছি, আর সইতে পারি না। বেরিয়ে যাও, নইলে চেঁচিয়ে লোক ডাকব—

সুধী। দুজনেই তা হলে ধরা পড়ব। আমার রক্ত আর তোমার রক্ত, দুটোতেই একই জিনিস রয়েছে।

[অজিত গিয়া সুধীকে ধরিল।]

অজিত। বেরিয়ে যাও।

সুধী। যাচ্ছি, যাচ্ছি, আজকের জন্যে—

অজিত। কিন্তু আমার ঘড়ি আর কলম? বের কর।

সুধী। (হাসিল) সত্যি, তোমার রক্তেও আছে। বাটপাড়ি রক্তই বটে—ধরে ফেলেছ।

[ঘড়ি ও কলম বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। এই সময়ে প্রবেশ করিল অমলা ও মণ্টু।]

অজিত। তোমরা এখানে?

মণ্টু। না এসে উপায় কি? তুমি যখন ডুব মেরেই থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছ, তা ছাড়া, দিদি—

অমলা। তুই থাম্ মণ্টু। কি তোমার হয়েছে অজিতদা?

অজিত। ব'স তোমরা। একে বিদায় করি আগে।

[অমলা ও মণ্টু তক্তপোষে বসিল। অমলা তাহার হাতের খদ্দরের ব্যাগ তক্তপোষের উপর রাখিল।]

সুধী। বিদায় আপাতত আমি হচ্ছি অজিতদা! এ সময়ে কি আমি ওই সব পাওনা-গণ্ডার কথা তুলে রসভঙ্গ করতে পারি? এতখানি হৃদয়হীন আমি নই।

[সুধী ইতিমধ্যে অমলার ব্যাগ হাতড়াইয়াছে, সকলের অলক্ষ্যে। সে অজিতের ও অমলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল।]

অমলা। এ কে অজিতদা?

[সুধী আবার প্রবেশ করিয়া অমলার ছোট্ট মনিব্যাগটা তাহার হাতে দিল।]

সুধী। আশ্চর্য! মাত্র দু'আনা পয়সা! ওদের যাবার ভাড়াটা তুমিই দিয়ে দিও অজিতদা। নমস্কার!

[ত্বরিৎপদে সুধী চলিয়া গেল।]

অমলা। এসব কি ব্যাপার?

[মণ্টু ছুটিয়া যাইতেছিল, অজিত বাধা দিল।]

অজিত। যেয়ো না মণ্টু। এসব আমার প্রায়শ্চিত্ত অমলা। কৈশোরে কত স্বপ্নই ছিল মনে, কি ভবিষ্যৎ সুখস্বর্গই না রচনা করেছিলাম! কিন্তু আজ! এখন ভাবি কি জান—বাস্তব বড় নিষ্ঠুর, তকে নিয়ে উন্মাদ কল্পনাই করা চলে শুধু।

অমলা। আগে বল দেখি, ওই লোকটি কে? ও কি সেই সত্য-সুন্দরের—

অজিত। হ্যাঁ, সেই। আমার পাপ। সত্যসুন্দরের পকেটমার ছেলে।

অমলা। তোমার পাপ?

অজিত। হ্যাঁ অমলা। কিন্তু সে কথা থাক্. তুমি এখানে কেন বল দেখি? তোমাদের খবরই বা কি?

মণ্টু। অজিতদার কি আমাদের খবর জানবার অবসর আছে? তবু ভাল। কলকাতায় এসে তোমাদের দেখে আমার ধারণা কি হয়েছে জান অজিতদা,—এখানকার জনমানুষ সবাই যেন—

অজিত। সবাই যেন কি?

মণ্টু। ঠিক কি আমি বোঝাতে পারছি না। তুমিই বল না দিদি!

অমলা। মণ্টু বোধ হয় বলতে চায়, সহুরে সভ্যতার মানুষগুলো যেন মেশিন, পাড়াগাঁয়ে সে মানুষ কিনা!

মণ্টু। ঠিক বলেছ দিদি। এখানে পাশাপাশি বাস করেও একজন আর একজনকে চেনে না, জানে না—

অজিত। ছেলেমানুষ হ'লেও সত্যি বুঝেছে মণ্টু। আমিও আজ হাঁফিয়ে উঠেছি।

মণ্টু। আমি ছেলেমানুষ?

অমলা। না, বুড়ো হয়ে গেছিস্।

মণ্টু। দেশে থাকলে ছেলেমানুষই থাকতাম। কিন্তু কলকাতায় থাকি যে, এখানে ছেলেমানুষ নেই।

অজিত। সত্যি নেই। আচ্ছা বুড়োদা, এই টাকা নাও তো, কিছু খাবার নিয়ে এস।

অমলা। না, না, খাবার কেন এখন?

অজিত। তোমাদের জন্যে নয়, আমার জন্যে। যাও ভাই—

[মণ্টু টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল।]

অজিত। ওকে সরিয়ে দিলাম তোমার সঙ্গে নিরিবলি প্রাণ খুলে দুটো কথা বলব ব'লে।

অমলা। সে আমি বুঝেছি। কিন্তু কথা কি তোমার কিছু আছে? তা ছাড়া যদি বহুদিন পর আমাকে সামনে পেয়ে কোন কথা বলবার আগ্রহ হয়েই থাকে, তা হলেও মণ্টুর থাকায় বাধা কি? কলকাতায় বাবা মা কিশোর-

কিশোরী ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রেমের ছবি দেখেন। বাবা হাসেন মার দিকে চেয়ে, ছেলে ভ্রূভঙ্গী করে বোনের দিকে চেয়ে. এই কলকাতার লোক আমরা—

অজিত। তবুও কি যেন একটা সঙ্কোচ, হয়তো বা পাড়াগাঁ এখনও কোথায় মনের কোন কোণে লুকিয়ে আছে ব'লে! তবে প্রাণ খুলে প্রেমালাপ করবার প্রাণ আর আমার কোথায় অমলা? বলতে চাইছিলাম, আমার জীবনে যে নাটক চলেছে তারই এমন এক দৃশ্যে এখন এসে দাঁড়িয়েছি—ট্র্যাজেডি ছাড়া তার কোন পরিণতি নেই। সেই ট্র্যাজেডি ঘটবার আগে একবার তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—

অমলা। শেষবারের মত অভিনয় করে যাবে? তোমার জন্যে দুঃখ হয় অজিতদা। কিন্তু আমাদের জীবনেও তো ট্র্যাজেডি চলছে। মেজদা চরম আঘাত দিয়েছে বাবাকে। মা তাকে ভুলতে পারেন না, বলেন, হাজার হোক সে আমার ছেলে, তাকে গর্ভে ধারণ করেছি। বাবা বলেন, সে ধারণ করেছিলে একটা মাংসপিন্ড, জীবন তাকে দিতে পার নি—আমি তুমি কেউই পারি নি, তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

অজিত। হারাণ বাড়ী আসে না?

অমলা। বাবা তাকে আসতে দেবেন না, দাদারও মত তাই। মেজদা বলে, ঈশ্বর ভাঁওতা, মা বাবা নাকি জৈবিক প্রয়োজনে ছেলের জন্ম দিয়েছেন, ছেলের তাঁদের প্রতি কর্তব্য কিছু নেই। সে রাজনীতি করে, ইউনিয়ন করে, ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট করে—স্পষ্টই বলে, বাবাদের মত বুর্জোয়ারা ধ্বংস হলেই তবে দেশের মঙ্গল! দাদাকে বলে, দালাল।

অজিত। আর তুমি?

অমলা। আমি কি, সে এখনও ঠিক করতে পারে নি। তাদের অরূপা এখনও আমার পেছনে লেগে আছে।

অজিত। হরিশদার খবর কি?

অমলা। দাদা এখন হকারি ছেড়ে রাস্তার পাশে ছোট্ট একখানা বইয়ের দোকান করেছে, খবরের কাগজের স্টল। বাবা আছেন ছাত্রদের নিয়ে। তাঁরা সহরের বাইরে এক টুকরা জমি নিয়েছেন—নিজেরা কি পরিশ্রম না করছেন সেখানে! আর আমার কথাও তো শুনতে চাও? আমরা আটটি মেয়ে

মিলে সেলাইয়ের কারবার চালাচ্ছি।

অজিত। জানি। বিশ্বাস আছে অমলা, মাস্টার মশাই আবার তাঁর বাস্তু গড়ে তুলবেন। কিন্তু আমার স্থান কোথায় বলতে পার?

অমলা। সে কথাই বলতে এসেছি অজিতদা।

অজিত। বলতে এসেছ? তাহ'লে এখনো—

অমলা। কি তুমি বুঝলে জানি না, তবে বলতে এসেছি—তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মাসিমারা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কেন, কি জানি আমার হাত ধ'রে কেঁদে ফেলে বললেন, তুমি আমার অজিতকে ফিরিয়ে এনে দাও মা। মেসোমশায়ও কি রকম হয়ে গেছেন। কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে এখন ঘরে বসে থাকেন। মাসিমা বলেন, তুমি না গেলে—সব যাবে।

অজিত। আছে কি?

অমলা। তুমি ফিরে যাও অজিতদা। আমার জ্ঞান বিশ্বাস কি বলে জান? বাবা ছেলেকে ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু ছেলে বাবাকে ত্যাগ করতে পারে না। জন্ম-পরিচয় কে কবে মুছে ফেলে দিতে পারে? বাবার শিক্ষা কি জান?—পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।

অজিত। শুনতে খুবই ভাল শোনায় অমলা।

অমলা। মেসোমশায় সংকল্প করেছেন সব কিছু তোমার হাতে তুলে দিতে। তুমি তা নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পার। ফিরে যাও। পাপকে অস্বীকার করা সহজ, কিন্তু স্বীকার করে নেওয়াই তো বলিষ্ঠতা।

অজিত। এত কথা তুমি জান অমলা?

অমলা। তোমার মাস্টার মশায়ের মেয়ে যে। মেসোমশায়ের কাছে ফিরে যাও। সত্যকে স্বীকার কর, তাঁকেও স্বীকৃতি দাও—এই তো বাঁচার পথ।

অজিত। আমাকে দার্শনিক ভাষায় উপদেশ দিচ্ছ অমলা। আমি যদি বাবাকে স্বীকৃতি দিই, তুমি পার আমার পাশে দাঁড়িয়ে দুনিয়াশুদ্ধ লোকের ধিক্কারের মাঝে তাঁকে স্বীকার করে নিতে?

[অজিত বলিতে বলিতে অমলার একখানা হাত ধরিল।]

অমলা। সত্যিই এবার নাটক আরম্ভ করলে। কিন্তু এটা যে মেসের ঘর। (অমলা ধীরে ধীরে সেই হাত ছাড়াইয়া লইল) আমি উপদেশ দিতেই

এসেছি, কাউকেই স্বীকৃতি দিতে নয়। আমার সে অধিকারই বা কোথায়? সে অধিকার বাবার। জান তো এখনো তাঁর হাতে বেত রয়েছে?

[উত্তেজিতভাবে একটি খাবারের ঠোঙা হাতে মণ্টু প্রবেশ করিল।]

মণ্টু। অজিতদা! ছেলেটাকে সবাই মিলে কি মার মারলে! মনে হ'ল যেন ওই যে—উঃ, শেষে পুলিশ এসে এম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেল।

[সত্যসুন্দরের প্রবেশ। ছিন্নভিন্ন বেশ।]

সত্যসুন্দর। হ্যাঁ, হাসপাতালে নিয়ে গেল।

অজিত। কাকে, কাকে নিয়ে গেল?

সত্যসুন্দর। একটা পকেটমারকে। দাঁড়াও, ধীরে ধীরে বলতে দাও।

অজিত। একগ্লাস জল দেব?

সত্যসুন্দর। না। ভেজা গলায় বল্‌তে হয়তো পারব না। আমিই তাকে প্রথম আঘাত করেছিলাম। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আমারই পকেটে হাত দিয়ে বললে, দাও, টাকা দাও। আমি হাত চেপে ধরলাম—বললাম, এত বড় দুঃসাহস তোর, প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে জোর করে আমার পকেট মারতে চাস? সে হেসে উঠল, 'চোরের ছেলে পকেটমার'—এবার থেকে রাহাজানি কর।' ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। 'পকেটমার' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে, তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর কেউ কিছু বুঝতে জানতে চাইল না, সবাই মিলে মেরে মেরে তাকে প্রায় শেষ করে দিল। প্রথম কিছু শব্দ করল না, কাঁদল না। কিন্তু যখন মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তখন ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলে দুবার--বাবা! বাবা!

অজিত। সে কি—?

সত্যসুন্দর। হ্যাঁ, সে আমারই ছেলে সুধী। যেয়ো না, কেউ তোমরা যেয়ো না। মৃত্যুই তার প্রাপ্য ছিল। পেয়েছে। আমার পাওনাও কড়ায়-গণ্ডায় ফিরে পাচ্ছি।—হ্যাঁ, কড়ায়-গণ্ডায়। আরও শোন, তোমার কাকিমা পালিয়ে গেছে, বলে গেছে, যে জীবন সে কাটিয়েছিল তাই ভাল। স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর বেঁধে থাকা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার—এবার শুধু বল, আমি কোথায় যাব, কি করব?

তৃতীয় দৃশ্য

[হরিশের বইয়ের স্টল। হরিশ বসিয়া হিসাব লিখিতেছে। দুই-একজন করিয়া ক্রেতা আসিতেছে যাইতেছে। কেহ কিনিতেছে, কেহবা শুধু পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার রাখিয়া যাইতেছে। এই সময়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন জীবনবাবু।]

হরিশ। আসুন জীবনকাকা। কিন্তু কোথায় যে বসতে বলব?

জীবন। ব্যস্ত হ'য়ো না, এ সব জায়গায় এলে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

হরিশ। উপায় নেই, ফুটপাথের ব্যবসায়ী। তা আপনি এদিকে?

জীবন। এদিকে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম, দেখে যাই নিজের চোখে তোমার ফুটপাথের ব্যবসা কেমন চলছে!

হরিশ। ভালই চলছে জীবনকাকা। তবে কয়েকটি লোক যেন একটা উৎপাতের চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে।

জীবন। উৎপাত? সে কারা?

হরিশ। দাঁড়ান, ঐ আসছেন তাঁদেরই একজন।

[একজন ক্রেতার প্রবেশ।]

ক্রেতা। কি দাদা! নতুন কোন বই এসেছে?

হরিশ। নতুন বই রোজই তো আসে।

ক্রেতা। আপনার তো সব আসে বুর্জোয়া শাস্ত্র। প্রগতিপন্থী কোন বই টই? স্টল চালু রাখতে হলে আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রাখতে হবে।

হরিশ। শ্রেষ্ঠ যে কোন্ সাহিত্য আর কি রাখা উচিত, সেটা যে ব্যবসা করে সেই ভাল বুঝবে নয় কি?

ক্রেতা। কার দালালী করছেন আপনি?

হরিশ। আপাততঃ নিজের—অন্য কারো নয়, কোন বিদেশেরও নয়।

ক্রেতা। বিদেশ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

হরিশ। এই যেমন রাশিয়ারও নয়, ইংরেজ মার্কিনেরও নয়।

ক্রেতা। বোঝা গেল কংগ্রেসের পাক্কা দালাল!

হরিশ। একদিন ছিল যখন সব্বাই ঐ কংগ্রেসে থেকেই বেড়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতার পরও দুর্দিন ঘোচাবার জন্যে কংগ্রেসের পেছনে অনেকে

ছুটেছিলেন, আবার এখনও দিল্লীর অন্তঃপুরে—থাক্, অতীতে একজন মনীষী বলেছিলেন, পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি থাকতে পারে না, আজ আমাদেরও কোন রাজনীতি নেই। তাই কোন দলও নেই। এসব কথা বলে হয়তো অনধিকার চর্চাই করলাম।

ক্রেতা। আপনারা পরাধীন?

হরিশ। না, উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুরা আজ ঘর বাঁধবে, আশ্রয় গড়ে তুলবে।

ক্রেতা। রাজনীতি ছাড়া তা হবে না।

হরিশ। হয়তো হবে না। কিন্তু আমাদের রাজনীতির শিকার না ক'রে আপনারা এত লোক আছেন, আপনারাই আমাদের হয়ে লড়ুন না। আর দোহাই, বিদেশীদের—সে রাশিয়া হোক, চীনই হোক, ইংরেজ-আমেরিকাই হোক—ডেকে আনবেন না। মোগল-পাঠান-ইংরেজ—

ক্রেতা। চমৎকার বক্তৃতা করেন তো! সেই বৃদ্ধ দালাল মাস্টারের শিক্ষা বুঝি?

হরিশ। যারা তর্কে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলতে জানে না, তাদের সঙ্গে তর্ক করি না।

ক্রেতা। সাবধান ক'রে যাচ্ছি, কলকাতার পথে বুর্জোয়া দালালী দেশ সইবে না।

হরিশ। শুনছি তো বুর্জোয়া বিপ্লবই ঘটবে এখন—তারাই নাকি বামপন্থীর মেরুদণ্ড, তবে এত ক্রোধ কেন?

[ক্রেতার প্রস্থান।]

জীবন। এ তো বড় ভাল কথা নয় হরিশ। কোন হাঙ্গামা না বাধে!

হরিশ। ভয় পেলে চলবে কেন জীবনকাকা? ভয় পেয়েই তো আমরা ভয়কে বাড়তে দিয়েছি।

জীবন। ভয় পেতেই হবে হরিশ। জান তো, কোন দুষ্কর্মই ওই সব অদ্ভুত স্বাধীনতাপন্থীদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

[মণ্টু প্রবেশ করিল।]

মণ্টু। দাদা, শিগগির বাড়ি চল।

হরিশ। কেন রে কি হয়েছে?

মণ্টু। মা কেমন করছেন, মুখে আর কথা নেই, বাবা স্কুল থেকে ছুটে এসে মাকে দেখে শুধু হাহাকার করছেন আর পাগলের মত হয়ে গেছেন।

হরিশ। কাল ডাক্তার ব'লে গেল, মার আর কোন ভয় নেই। মাকে নিয়ে নতুন বাড়িতে যাব, আবার শ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠা করব। এখনই মা যাবেন? সে হয় না, সে হয় না, হতে পারে না। জীবনকাকা, এ হতে পারে না।

[হরিশ দ্রুত সমস্ত গুটাইতে আরম্ভ করিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[হরিহরের বাড়ী। রুগ্নশয্যায় সিদ্ধেশ্বরী শায়িত। অমলা পাশে বসিয়া আছে। হরিহর উন্মত্তের মতো পায়চারী করিতেছেন।]

হরিহর। আর পাশে বসে আছিস কেন অমু, কাকে আগলাচ্ছিস? সরে আয়, সরে আয়। এসে নতুন যে আঘাত আস্‌ছে তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌।

অমলা। তুমি শান্ত হও বাবা, মণ্টু দাদাকে ডাকতে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই ডাক্তার নিয়ে আসছেন।

হরিহর। ডাক্তার! এখনও ভরসা করিস্‌ তুই? না রে, আর কোনও ভরসা নেই। আমার মন ডেকে বলছে—নেই নেই, কোন ভরসা নেই। কেন দেশ ছেড়েছিলাম? একে একে সবাইকে হারাব বলে? ছেলে ছেড়ে গেছে রাজনীতির তাড়নায়, মা গেল তারই বিচ্ছেদের আঘাত সইতে না পেরে। এবার আমি যাব। কেন এই সংগ্রাম, কেন এই অক্লান্ত চেষ্টা? সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। বাস্তু যারা হারিয়েছে তাদের বাঁচতে নেই, তারা বাঁচতে পারে না।

অমলা। কেন বাঁচবে না বাবা, তারা বাঁচবে।

হরিহর। বাঁচার পথ কোন্‌টা? হারাণের পথ, না, আমার পথ? বাঁচার পথ হত্যার বিভীষিকায় পূর্ণ, না, মানবতার শান্তির মন্ত্রে মুখরিত? বাঁচার পথ গদীর সংগ্রামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, না, প্রতিষ্ঠার জন্যে নীরব শান্ত অক্লান্ত চেষ্টায়? কোন্ পথে বলতে পারিস্? পারবি না। আমিই পারি নি, ব্যর্থ হয়েছি, আমার সমস্ত ধারণা, সমস্ত বিশ্বাস আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে।

[অভিনয় চলিতেছে—দর্শকদের মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ চীৎকার করিয়া করিয়া উঠিল, "না, না, যায় নি।" একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইল, "থামুন, থামুন", "কে রে বাবা?" ইত্যাদি রব উঠিল। হরিহর সিদ্ধেশ্বরীর শয্যা-পার্শ্বে ছুটিয়া গেলেন।]

হরিহর। বড় বউ, তুমি চললে? তুমি আজ দিব্যধামে যাচ্ছ, দিব্য-দৃষ্টি তোমার খুলেছে। তুমি হয়তো পথ দেখতে পাচ্ছ, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছ, বল দেখি, কার পাপে আজ আমাদের এ অবস্থা? আমরা—প্রজাদের পাপে, না, রাজার পাপে? বল, বল, বল, একবার কথা কও।

অমলা। পাপ! কার পাপে সে কি আমরা জানি না বাবা? পাপী যারা দেশ ভাগ করবার জন্যে চীৎকার করেছে—তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি, পাপী যারা ক্ষমতার মোহে দেশকে ভুলে গেছে, পাপী যারা গৃহহারা সর্ব-হারা করে আজ পথের ভিখিরী আমাদের মৃত্যুর মুখের গ্রাস করে তুলেছে।

[দর্শকদের মধ্য হইতে একজন—"এ আমার, এ তোমার পাপ।" আবার হট্টগোল।]

হরিহর। কিন্তু, তোর মা যে কথা বলে না রে? কেন বলে না? আর বলবে না?

[হরিহর আবার পায়চারী করিতে লাগিলেন।]

অমলা। মা! শুনছ না, বাবা তোমাকে ডাকছেন, আমি তোমাকে ডাকছি? মেজদাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। একবার চোখ মেলে চাও, কথা বল। (তারপরই আর্তনাদ করিয়া উঠিল) মা, মাগো—বাবা! মা আর নেই।

হরিহর। নেই? শেষ হয়ে গেছে? তাই ভাল। চীৎকার করে কাঁদিস্ না, ঘুম ভেঙে নন্তু এসে আবার ওঁর পথে দাঁড়িয়ে বাধা দেবে। চীৎকার করিস নে, নীরবে চোখের জল ফেল্ আর—

[আর একটি ঘর হইতে ঘুম ভাঙিয়া নন্তু ছুটিয়া আসিল, 'মা! মা!

মা! মা।' অমলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

হরিহর। না, তা হয় না। মরণের দুর্দিন যে যেখানে আছে তাকে নাড়া দিয়ে বলে—ওরে আমি এসেছি—তাই সবাই ছুটে আসে।

[দর্শকদের মধ্য হইতে আবার সেই কণ্ঠ—"এসব কি হচ্ছে?" আবার হট্টগোল। এদিকে জীবনবাবু মণ্টুর কাঁধে হাত রাখিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

হরিহর। আস্তে, আস্তে মণ্টু। দেখছিস্ হঠাৎ আমি কেমন ধীর স্থির হয়ে গেছি। মরণ এলে এমনি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। হরিশ কোথায়, হরিশ? ডাক্তার আনতে গেছে বুঝি? এদিকে যে মরণ এসে পেঁাছে গেছে রে।

মণ্টু। দাদা মোটরের তলায় পড়ে—

[সেই দর্শক—"মিথ্যা, মিথ্যা।" অন্যান্যরা, "উন্মাদ। বের করে দাও।"

হরিহর। (কাঁপিতে কাঁপিতে) হরিশ মোটরের তলায় পড়ে মরেছে? সুসংবাদ, সুসংবাদ, জীবন! এই তো জীবন। তবে কেন আর ঘরবাড়ি, কেন এই মিথ্যার পূজা! শ্যামসুন্দর, তুমি নেই—ভগবান, তাও মিথ্যা—

[দর্শককণ্ঠে—"আছেন—আছেন"]

হরিহর। নেই, আছে শুধু এই দেহ আর মৃত্যু। আজকের ভারতে জীবন মিথ্যা, মৃত্যু সত্য।

[টলিতে টলিতে হরিহর স্ত্রীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে গেলেন। গিয়া তাহার গায়ে কম্পিত হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

হরিহর। বড় বউ, তুমি ভাগ্যবতী, পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোন নি, সিঁথেয় তোমার সিঁদুর, মুখে হাসি! (সহসা আর্তনাদ করিয়া) আর আমি?

[হরিহর উন্মাদের মতো টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময়ে হারাণ আসিয়া প্রবেশ করিল। মণ্টু তাহার দিকে আগাইয়া গেল।]

মণ্টু। এখন তুমি এসেছ মেজদা? কি দেখতে এলে? একবার তোমার আওয়াজ তোল, তা হলে?

হারাণ। অশান্ত হোস্ নে। এর প্রয়োজন ছিল মণ্টু, ঐতিহাসিক প্রয়োজন। এমনি করে মরে মরে তবে তো তৈরি করে দেবে ওরা আমাদের এগিয়ে চলার রাজপথ। আয়, আজ আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের

নামে শপথ নিই, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

[দর্শকদের করতালি। যবনিকা পড়িতে লাগিল। সেই দর্শক "এ মিথ্যা, ভুল" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মঞ্চের দিকে আগাইয়া গিয়া মঞ্চে উঠিয়া পড়িলেন। দেখা গেল সর্বপ্রথমে প্রস্তাবনায় যে লোকটি নাট্যকারকে ডাকিয়া কথা বলিয়াছিলেন, সেই আগন্তুক তিনি। তিনি যবনিকা তুলিয়া ধরিলেন।]

দর্শক। এ হতে পারে না। এ মিথ্যা, এ ভুল। হরিহরের জীবন-নাটক এ নয়। তোল, তোল যবনিকা।

[যবনিকা আবার দুলিতে দুলিতে উঠিতে লাগিল। দর্শকমহলে তুমুল হট্টগোল।]

দর্শক। আপনারা স্থির হোন, শান্ত হোন। আমিই আসল হরিহর। যে নাটক অভিনীত হ'ল, তার সত্যিকার নায়ক। আপনারা স্থির হয়ে বসুন।

[পরিচালকের প্রবেশ।।

পরিচালক। এ সব কি হচ্ছে, কে তুমি?

হরিহর। নাট্যকারকে ডাক, জানবে কে আমি। নাট্যকার! নাট্যকার!

[নাট্যকারের প্রবেশ।]

নাট্যকার। মাস্টার মশায়, আপনি?

হরিহর। হ্যাঁ, আমি। বেত হাতে নেই নাট্যকার। এই নাটক নিয়ে অভিনয় করতে বলেছিলাম তোমাকে? মৃত্যুর পর মৃত্যু! শ্মশান দেখাবে না, একসঙ্গে দু' জোড়া চিতা? চমৎকার নাটক!

নাট্যকার। আমরা যা লিখি, তাই পুরোপুরি কি অভিনীত হতে পারে মাস্টার মশায়? দর্শকদের দিকে চেয়ে, তাদের চোখে অশ্রুর বন্যা বহাবার জন্যে পরিচালককে অনেক পরিবর্তন করতে হয়। ট্র্যাজেডি দেশ ভালবাসে, মৃত্যু দেখে খুসী হয়, তাই—

হরিহর। থাম, পরিচালক তাই অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। জীবনের দিকে পেছন ফিরে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করেন। গড়ায় করতালি নেই, করতালি আছে ভাঙায়। মানুষকে জীবনের প্রেরণা না দিয়ে নৈরাশ্যের আঘাতে মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হয়, সস্তা আবেদন সৃষ্টির জন্যে? চমৎকার! প্রগতির পথেই শিল্পকে তোমরা নিয়ে চলেছ।

পরিচালক। এটা পাগলাগারদ নয়, থিয়েটার।

হরিহর। পাগলাগারদ ব'লেই তো মনে হয়। নইলে আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের যে-কোন ভাবেই মেরে ফেলে বাহাদুরি দেখাচ্ছ? মানুষ শুধু টপ টপ করে পথেঘাটে পড়ে মরছেই, তারা বাঁচবে না, বেঁচে নেই? সত্যজ্ঞান ফিরে পাও পরিচালক। দর্শকদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁরা আমার জীবনের সত্য নাটক—এ নাটকের সত্য উপসংহার দেখতে চান কি না?

দর্শকগণ। দেখতে চাই, দেখতে চাই।

হরিহর। ওই শোন। নাট্যকার, পরিচালক! ঘোরাও মঞ্চ, দর্শকদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত কর সত্য দৃশ্য। চীৎকার করে জানিয়ে দিলে শ্যামসুন্দর নেই? তোমরা কি দেখেছ এ দেশের লোককে? তাদের দেখ, জান, দর্শকদের জানাও। দেখ নি এই বাংলাদেশেই দক্ষিণেশ্বরে, তারকেশ্বরে, কালীঘাটে, গ্রহণ-যুগে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে? সেই অগণিত জনতাই তো তোমার দেশের সত্যিকার মানুষ। হিন্দুকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে, ভারতকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে। পল্লীর ঘরে ঘরে ব্রতপার্বণ, মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরের আরাধনা দেখ নি? রাজপথের ক'জন লোকের শোভাযাত্রা দেখে মুগ্ধ হও, ওদের দেখতে পাও না। প্রাণকে উপেক্ষা করে কঙ্কাল নিয়ে তোমাদের ব্যবসা। ঘোরাও মঞ্চ, বাস্তুহারাদের আসল রূপ দেখাও। নিয়ে চল সেখানে, যেখানে হাজার হাজার বাস্তু তারা গড়ে তুলেছে আর গড়ে তুলেছে নূতন একটা জাতির জীবন। শুধু তারা রেলওয়ে স্টেশনে আশ্রয়-শিবিরে পড়ে নেই। চল, নিয়ে চল, দেখাও সে অপূর্ব সংগ্রামের সাফল্য, অন্যদের গড়ার দুর্জয় সংগ্রামে প্রেরণা দাও। মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করবার চেষ্টা কর। আর এস, দেখবে এস, আমার কুটির—আমার শ্যামসুন্দরের মন্দির। এই শীর্ণ দু হাতের আর পুত্র-কন্যার অক্লান্ত শ্রমে আমার শ্যামসুন্দর আবার ফিরে এসেছেন। বড় বউ, হরিশ, অমলা, মণ্টু, নন্তু সবাই এসো, এঁদের আমন্ত্রণ জানাও—

[মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ—সঙ্গে মৃদঙ্গ-করতালের বোল ও কীর্তন। ক্রমশঃ দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। শ্যামসুন্দরের মন্দির। নিকটে দূরে সারি সারি অগণিত উদ্বাস্তু-গৃহ। টালির ঘর। শ্যামসুন্দরের মন্দিরে আরতি হইতেছে। দলে দলে লোক আসিতেছে। হরিহর

ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরদ্বারে বসিয়া আছেন। তাঁহাদেরই পাশে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়াছেন নিরঞ্জন রায় ও সত্যসুন্দর। হরিশ, অজিত, অমলা ও মণ্টু সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছে। নন্তু চারদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। হরিহর উঠিয়া আসিয়া অজিতকে ডাকিলেন।]

হরিহর। অজিত! এদিকে এস।

অজিত। আমাকে কিছু বলবেন?

হরিহর। হ্যাঁ বাবা! অমু—চলে যাচ্ছিস্ কেন, এদিকে আয়। অজিত, তুমি অমলা দু'জনে দেখো, হরিশ তো আছেই—অভ্যর্থনায় যেন কেউ কোন দোষ না ধরতে পারে।

অজিত। আমরা—?

হরিহর। হ্যাঁ, তোমরা। লজ্জা কেন, আজকের যুগের তরুণ-তরুণী, আমার ছেলে ও মেয়ে। একদিন দেখব তোমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়াবে।

অমলা। বাবা!

অজিত। আশীর্বাদ করুন—

হরিহর। ঠাকুরের বাড়ীতে তিনিই শুধু আশীর্বাদ করবার অধিকারী।

[সহসা মণ্টু বাবার কাছে ছুটিয়া আসিল।]

মণ্টু। বাবা!

হরিহর। কি রে?

মণ্টু। আমাদের স্কুলের আগেকার সেই ছেলে ক'টি বাবা, যারা স্কুল ছেড়ে গিয়েছিল—

হরিহর। তারা কি করেছে?

মণ্টু। এখানে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, লজ্জায় আসতে পারছে না।

হরিহর। লজ্জায়! ওরে, তোরা আয়, আয়। মণ্টু, নিয়ে আয় তাদের। ওরে—

[মণ্টু গিয়া ছেলেদের লইয়া আসিল। তাহারা আসিয়া মাস্টার মশায়কে প্রণাম করিতে গেল।]

হরিহর। না রে না, এখানে আমি কেউ নই, ওই শ্যামসুন্দরকে—ওই ঠাকুরকে প্রণাম কর্।

[তিনি তাহাদের জড়াইয়া ধরিয়া মন্দিরদ্বারে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নন্তু হারাণের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিল।]

নন্তু। বাবা, মা, দেখ কে এসেছে! এস মেজদা। যাও, ঠাকুরকে নম কর, নইলে ঠাকুর রাগ করবেন, পাপ দেবেন।

[হারাণ শ্যামসুন্দরের সম্মুখে প্রণত হইল।]

সিদ্ধেশ্বরী। হারাণ এসেছে! ওগো, তুমি আর—

হরিহর। ভয় নেই বড় বউ। আমার হারাণ শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করছে। প্রণাম কর্ হারাণ। এই তো বিপ্লবের দেবতা। অত্যাচারী, অনাচারী, পীড়ক কংসকে ইনিই ধ্বংস করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের বিপ্লবে ইনিই তো ছিলেন নেতা। তিনি অন্যায়কে ধ্বংস করেন, আর সত্য ও সুন্দরকে —নূতন মহাভারতকে সৃষ্টি করতে তিনি এ যুগেও জেগে আছেন। তিনি আমাদের সত্যের পথ, জীবনসংগ্রামের পথ দেখাবেন। তাঁর জয়ধ্বনি কর্— জয়ধ্বনি কর্!

॥ শেষ যবনিকা ॥